প্রথম প্রকাশ : ১৫ নভেম্বর ১৯৭১

সংবাদ বিচিত্রা
SANGBAD BICHITRA

ONLY OFFICIAL NEWSPAPER OF CAB

প্রকাশনায় : বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ ▪ CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL ▪ NORTH AMERICA

অ নু গ ল্প

এসকর্ট

কোহিনূর কর

অ্যারিজোনা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

সবে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়া শেষ করে বাড়িতে থেকে চাকরির খোঁজ চলছে। ইন্টারভিউ-এর জন্যে অপেক্ষা, আর বাকি সময় বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, প্রেম-ট্রেমের ঝামেলাও নেই। পুজোর ক'দিন আগে মামাতো বোন তিন্নির তলব। চার-পাঁচ জন স্কুলের বান্ধবীদের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে বেরোবে। এসকর্ট হিসেবে বেকার এই দাদাকে পাওয়া সবচাইতে সোজা। দাদাও এক কথায় রাজী। ভাবলো মন্দ কী?

সেবছর পুজোর কিছুদিন আগে আবার আমাদের সবার প্রিয় শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় চলে গেলেন। আর বাঙ্গালী যাবে কোথায়! সব পুজো মন্ডপে ঘুরেফিরে সেই হেমন্তর গান। হয় বাংলা নয় হিন্দী। কিছুটা কালো-হলুদ ট্যাক্সিতে চেপে বাকিটা পায়ে হেঁটে প্রায় এক ডজন ঠাকুর দেখার পর সবারই মনে হতে লাগলো, এই শরতে হেমন্তের বাইরে কেউ কিছু ভাবতেই পারছে না।

গড়িয়াহাট চত্তরে এসে, "তোদের কি ক্ষিদে-টিদে পায় না?"

সবাই একবাক্যে, "পায় তো বাবু-দা, তুমি খাওয়াবে?"

"খাওয়াবো, একটা শর্তে, গান গাইতে হবে।" পাশেই এক ফুচকা-ওয়ালা খদ্দের সামলাতে ব্যস্ত। একটু অপেক্ষা করতেই সবার হাতে একটা করে শালপাতার বাটি এসে গেল। সবাই মুহূর্তের মধ্যে শ'খানেক ফুচকা সাবাড় করে দিল।

খাওয়া শেষে আবার হন্টন। তিন্নি তার প্রিয় বান্ধবী মিষ্টুকে বলল, "এবার দাদাকে একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত করে শোনা তো, এই পথ যদি না শেষ হয় আমাদের পেছন ছাড়বে না!" মিষ্টুর খুব বড়সড় চেহারা কিন্তু গলাটা খুব মিহি। একটু খোশামোদের পর খোলা আকাশের নীচে "আমার এই দেহখানি তুলে ধরো—" করতেই বাবুদার মাথায় হাত। সব্বোনাশ, প্রথমেই বলছে তুলে ধরতে!

বাবুদা তখন মনে মনে ভাবছে, প্রেম আর এ-জীবনে হবে না। মিষ্টুকে তুলে ধরার মত গায়ের জোর আমার নেই। ওদের এসকর্ট হিসেবেই ঠিক আছি।

রম্যরচনা

পদবী বিভ্রাট

রেশমী গোস্বামী

নিউ জার্সি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

আমার নাম ছিল বিয়ের আগে রেশমী রায়চৌধুরী, বিয়ের পর অ্যাড হলো গোস্বামী, আমার নাম লিখতাম রেশমী রায় চৌধুরী গোস্বামী, অতগুলো সারনেম না হ্যান্ডেল করতে পেরে লাস্ট-এ রায় চৌধুরী টা সরিয়ে বৈবাহিক নিয়ম অনুযায়ী গোস্বামী লিখতে শুরু করলাম মেয়ের জন্ম হওয়ার পর। হঠাৎ তারপর জানলাম নিয়ম হয়েছে যে সন্তান তার মা এর আর বাবার দুজনেরই সারনেম ইউজ করতে পারে। তখন একটু আফসোস হলো যে ইস সারনেমটা ছোট না করলেই ভালো হতো। কিন্তু আবার ভাবলাম যে এখন মেয়ের নাম শ্রীয়াংশী গোস্বামী, আমার পুরো সারনেমটা অ্যাড করলে হত শ্রীয়াংশী গোস্বামী রায় চৌধুরী বা শ্রীয়াংশী রায় চৌধুরী গোস্বামী। বাবারে! অত অবধি ঠিক এগোচ্ছিল চিন্তাভাবনা, ঠিক তারপরই মাথায় এলো যে মেয়েরও তো একদিন বিয়ে হবে, তখন যদি সেই সারনেম আমার বিয়ের আগের 'রায় ও মার্টিন' নানা!! 'রায় ও চৌধুরীর' মতো দুটো pre added case হয় তাহলে ওর নামে রায় চৌধুরী গোস্বামী-র সাথে আরও দুটো অ্যাড হবে, দুটো ছেড়ে দিলাম, একটা বামুন ঘরে বিয়ে হলে তো একটা সারনেম ৩টির সমান হবে যেমন আমার দিদি আর যেমন আমার বাবার বাড়ির আসল সারনেম চট্টোপাধ্যায়, তারপর উপাধি নিয়ে রায় চৌধুরী, যদিও আমার বর বামুনের সারনেমটি তুলনামুলক ছোট, এরও একই কেস, আসল সারনেম মুখোপাধ্যায়, উপাধিটা ভাগ্যিস পেয়েছিল!! মানে জীবনে নাম-এর পাশে এত বোঝা বাড়িয়ে লাভটা কী। এত লম্বা রেলগাড়ি বানিয়ে হবেটা কী। তার থেকে ভাই একটাই ঠিক আছে সারনেম, আমি বিবাহের পর পাওয়া রেশমী গোস্বামীতেই খুশী।

My memoir, "**One Immigrant, A Hundred Stories**". Is now available on amazon.com under "Books".
I am not a celebrity. So, why did I write my life story?
Because I sincerely believe that immigrants like us have many interesting stories to share with their families and friends but they rarely do so. The stories die and are forgotten with the passing of the immigrant.
I got the inspiration to write when a close friend died, and his daughter discovered that her father had left a surprise gift for the family–in the form of an unpublished autobiography. My friend had wanted to share his life story with his children!
Yes, I too have many stories to share with my family and friends. Please read the back cover (shown above) to get an idea. And buy a copy from Amazon if you find the summary interesting. **Price is $12**.
Author can be reached at **debsmee572@gmail.com**

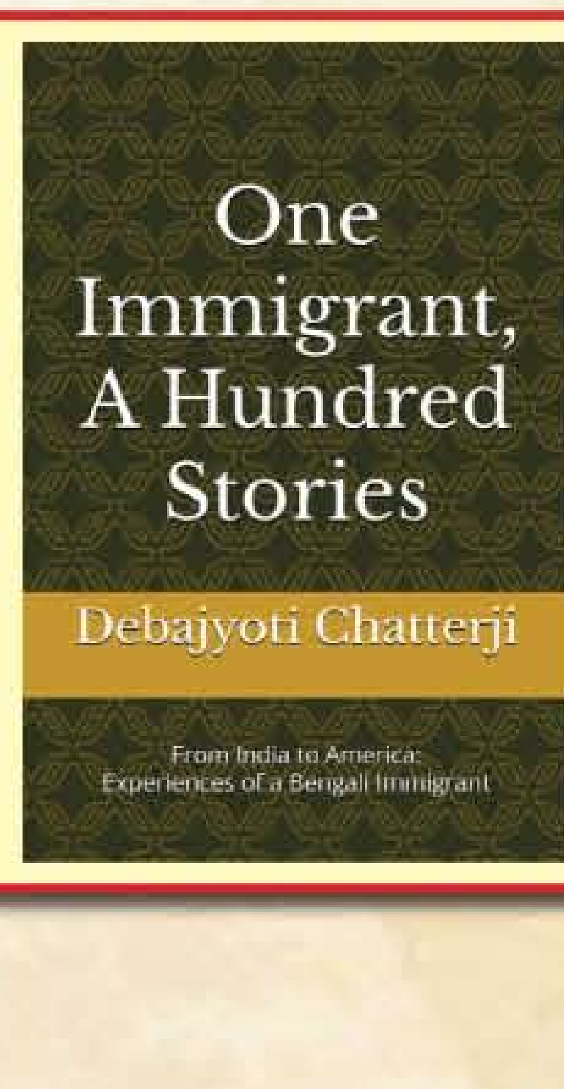

MATRIMONIAL INVITATION

A matrimonial match is invited from educated girls for a 35 yrs old, 6 ft 2 in tall educated in Canada and USAPGDM from Canada and MS (IT) from NYIT, a software professional working for a reputed bank in Pittsburgh, Pennsylvania, holding a H-1B Visa Sponsored by father (US Citizen) for Green Card, both sisters are living in NJ & CA Father a retired Indian Army Officer (Colonel).

Please reply at :

Email - adas03112@gmail.com

কবিতা

হৃৎপিণ্ড

রুদ্রশংকর
জর্জিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

শুনেছি একটি মেয়েকে বিয়ে করে ভাল আছে তিমিরকান্তি,
ইয়ার্কি মারতে মারতে মেয়েটির গালে চুমু খায়
আর সঙ্গে সঙ্গে হাতের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে যায় উপাসনা-ধর্ম

শুনেছি ঢাকা শহরের ধুলোয় ভাল আছে পারভেজ চাচা,
হয়তো তামান্নার জন্য
চোখের অন্ধকার আজকাল ততো অন্ধকার হয় না,
তাই শীতের রাতে শরীরে শিস দিয়ে ওঠে প্রেম

জানি, আমার মাথার নিচে হৃৎপিণ্ড,
হৃৎপিণ্ডের নিচে যৌনতা তালগোল পাকিয়ে বাড়ে
মনে হয় আমার চারপাশে খিদে বাড়ছে,
মিনিটে মিনিটে দাম বাড়ছে খাবারের।

সাবাস তালাক

মৌ মধুবন্তী
টরোন্টে, কানাডা

কাঁদবে যদি নিজের চোখেই কাঁদো
খাবারটাও নিজের স্বাদে রাঁধো
এলোচুলে আলগা খোঁপা বাঁধো
বাধা দিলেই পালটা লড়াই বাধো।

তোমার জীবন তোমার হাতে গড়ো
মিথ্যাচারের ছায়া থেকে তুমি অনেক বড়ো
সে ছায়াটা মাথা থেকে সরাও
বুদ্ধিমত্তার আপন ছড়ি দুনিয়া জুড়ে ঘোরাও।

তালাক একটি শব্দ কেবল, বিচ্ছেদ অনল নয়
সব তালাক-এ জীবন কিন্তু ধ্বংস নাহি হয়
আগে বাড়ো শক্তি গড়ো পূর্ণ করো স্বপ্ন
নির্যাতিত জীবনটাই বড় বেশী নগ্ন।

হাসি মুখে আয়না দেখো, দেখো নিজের মুখ
সবচে' সুন্দর তুমি একা, এটাই মহান সুখ
সুখের ঘরে ইঁদুর মরে, দুখের ঘরে বাসর
তালাক দেয়া ভূতগুলো সব ভয়েতে কাতর।।

মন

শ্রাবণী রায় আকিলা
টেক্সাস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

কখনও সকাল থেকেই আকাশে
অভিমানের মত একটা জলরঙ থাকে,
গড়িয়ে পড়ার মত জল থাকে না ...
আকাশ প্রয়োজনে জল লুকোতে জানে
মেঘেদের আশেপাশে।

দুপুরে মাঝে মাঝেই অনেক কিছু বলতে চাওয়া..
একটা চাপা হাওয়ার ফিসফাস আসে কানে,
ঝড়ের আভাস থাকে
তবু ঝড় আসে না!
শেষ মুহূর্তে সামলে নেয়...
নদীপাড়ের ঘর সে আগলাতে জানে।

বিকেলের একটা চলে যাওয়া থাকেই...
সন্ধ্যের কোনো কিছুতেই যায় আসে না!
সে বিরতির গান গায় আনমনা সুরে,
তারপর শেষ আলোকেও চলে যেতে দেয় নীরবে।

এতো কিছুর পরেও...
কারা যেন নদীর দুকূলে দাঁড়িয়ে শুধু বোঝে...
তারা সংক্রামিত কোনও এক অজানা রোগে
অনেকদিন! হারিয়েছিল একদিন যে মন—
আজও তারা ফিরে ফিরে সেখানেই খোঁজে।

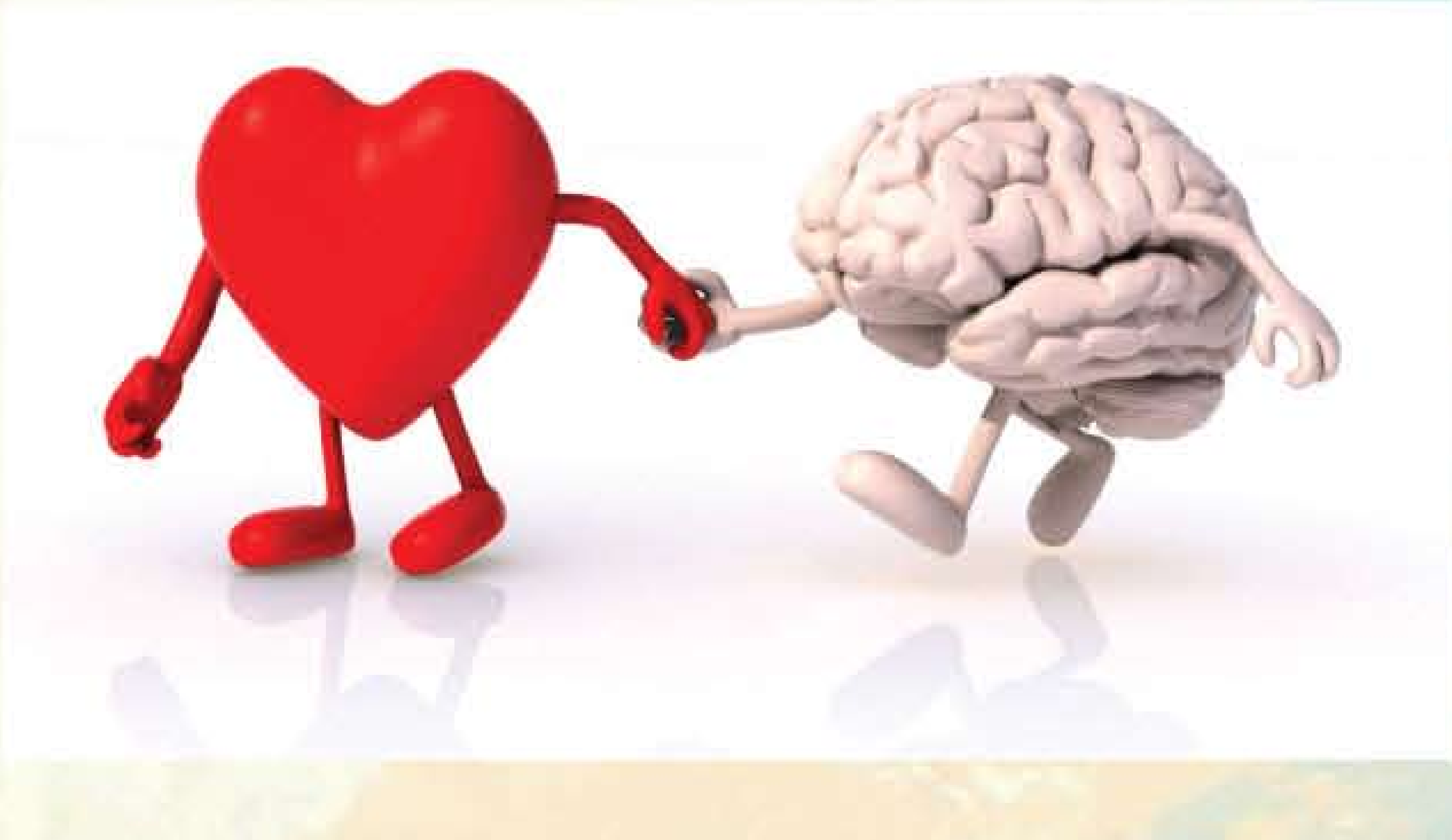

ফুলডুঙড়ি আর পৌষালী রোদ

তাপস কুমার রায়
সিনসিনাটি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

হরেক কাজে আজে বাজে
তোমায় লেখা হয়নি আগে

কেমন আছো ফুলডুঙড়ি?

কেমন আছে কুয়োতলা
শালের বন আর লালমাটি ?

বর্ষা এখন যাওয়ার পথে
দানা-দানা সুখ জানলা-রোদে

ভালোবাসাও।

রোদের সোহাগ এসে বসে
নিকনো উঠানের গা ঘেঁষে
বুধন বুড়োর জাম গাছটার গায়ে

আর স্নানের পরে তোমার ভেজা পায়ে
উঠোন জুড়ে পদ্ম শালুক ফোঁটে
লক্ষ্মী আসে জলের আলপনায়।
আলপনারাও কেমন যেন ক্ষনেক থামে
দাঁড়ায়—আবার হাঁটে, মুছে যায়

বেথুয়াডহরীর কাংরাগুজাকে মনে আছে?
বিকেল হলে উনুন জ্বালাতো রোজ
আর পথ খুঁজে খুঁজে শীত এসে পড়তো ঠিক
শেষ বিকেলের সেই ঘুঁটের ধোঁয়ায়
কাংরাগুজার শিস্ দেওয়া রুক্ষ ঠোঁটের ডগায়

কথায় কুকথায় মনে পড়লো
তোমাকে একটা
র‍্যাপার কিনে দেব ভেবেছিলাম, হয়নি

আসলে শহরে এতো যুদ্ধ জানো তো
দুদন্ড মন বসে না আর
ফেলে আসা উঠোনের নিরালায়

হাওয়ারা উদাসীন হলেও
তোমার খবর নিয়ে আসে ঠিক
এতো মানুষ মারে মানুষ রোজ
উদাসীনতাই বোধ হয় একমাত্র ওষুধ
যা খেলে ভালো থাকা যায়

কবিতা

তবুও তো রোদ ওঠে সোনার বালির মতো
রোজ এসে বসে তোমার চোখের পাতায়
ক্লান্ত ঘরে ফেরা বিকেলের শেষে

এরকম রোদে বসে একদিন
ক্লাস নেবে তুমি সাওতালি ভাষায়
তোমার হরিণ চোখে
বিকেলের ছায়া দেখতে দেখতে
সৃজন বিন্তির গল্প শুনবো আমি

ফাঁকা ক্লাসঘরে শীত জমবে গুঁড়ো গুঁড়ো

পৌষ নামবে ফুলডুঙড়ি ধানের মাঠে
পৌষ নামবে; খেজুরের গুড়ের মতন
যেমন রোদ নামে তোমার ঢালু ঘাড়ের বাঁকটায়

আমার আমিকে

সঞ্জয় চক্রবর্তী
নিউ সাউথ ওয়েলস, অস্ট্রেলিয়া

জানিস? তখন বৃষ্টি নেমেছিল,
দুপুরবেলায় মনখারাপি মেঘের সাজ,
ভিজব না, তাও ভিজেই গেলাম, শেডের তলায় দাড়িয়ে গেলাম,
জলের ছাটে ভিজল জামা, ঝাপসা কাঁচ,
তুই তো তখন কাজের শেষে ই-মেল খুলে বসলি এসে,
জানলিও না ভিজল কে আজ বৃষ্টিতে,
হাওয়া-মোরগ ঘুরল দূরে, মেঘ উড়ে যায় সমুদ্দুরে
মনেই লেখা মনের চিঠির সৃষ্টিতে,
ডলার স্ট্যাটাস হুডখোলা কার,
দারাপুত্রকেই বা যে কার,
সকাল বিকেল দিন কেটে যায় মুখ বুজে,
ন-টা ছ-টা অফিস করি, বদ্ধঘরে হাঁপিয়ে মরি,
মনখারাপের মনকে চাপি মুখ গুঁজে,
সন্ধেবেলায় আলোয় মোড়া, রাস্তা শুধু ভীড়েই ভরা,
তুই তো তখন আলতো ঘুম আর গল্পবই,
ভাবতে ভাবতে ড্রাইভ করি, ক্রসিং এলে আস্তে করি,
লুকিয়ে দেখি ফোনের স্ক্রিনে ম্যাসেজ কই?
জীবন কাটে কায়ক্লেশে, তবুও তো প্রেম সর্বনেশে,
দূর সয়েছি একলা মনে রই,
চলতে চলতে থমকে দাঁড়াই, অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াই,
আজও খুঁজি আমার আমি কই?

কবিতা

বিকেল রোদে

উদ্দালক ভরদ্বাজ
টেক্সাস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

একটা কোথাও লুকিয়ে থাকে ইচ্ছে গুলো—
একটা কোথাও মনের মানুষ, মনের বাইরে।
একটা কোথাও স্বপ্ন ভোরের, ফানুস ভাসে
জীবন ডাকে আয় না একটু, বাইরে আয় না!

একটা কোথাও বড়রা খুব বাচ্চা হয়ে—
বাঁচতে চাইছে, খুঁজছে একটা হাত, ধরবার।
যেমন নদী পেরিয়ে যাওয়া খরস্রোতা,
যেমন পাঁচিল জাল-লাগানো, পুরনো স্কুল

মাঠের পাশে অনেক হাসির নীল ফোয়ারা,
যেমন অনেক ভাঙা-গড়া, বন্ধু ও ভুল,
তেমন একটা বন্ধু চাইছে মনের মধ্যে
একটা ছেলে, দামালপনার কাঙ্গাল হয়ে।

একটা ঘরে তাই এখনও লুকিয়ে বাঁচা,
হলদে-হওয়া চিরকুটে প্রেম যেমন লেখা
সহজ ছিল, গোপনে হাত ধরার মত—
সহজ ছিল সরল চোখে তাকিয়ে থাকা...

তেমন যেন তাকাতে চায় আজকে কোটর—
গর্তে ঢোকা, চোখের হলুদ আলোর আভাও
একটা কোথাও একটু দামালপনার জন্যে—
একটু সহজ ভালবাসায়, আখরবিহীন—

বন্ধু তোমার হাত ধরতে ইচ্ছে করে...
গোপন ঘরে, বিকেল রোদের বারান্দাতে!

কবির জানালা

বেনজির শিকদার
নিউ ইয়র্ক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

জ্বালিয়ে যাও শব্দ-আলো মানুষ ধরে মনে;
কবির প্রকাশ কাব্য-ভাষায়; সাধনা নির্জনে।
কবির শব্দ আকাশচুম্বি- মাটির সাথেও যোগ;
শব্দে কুড়ায় মানবদর্শন, জীবন উপভোগ।

কবিতা সেই অরূপনদী আড়াল-দিনের কথা;
কুসুম-কোমল কবির আঙুল, কাব্যে ফলায় ব্যথা।
কবির চোখে অন্ধকারেও ঠিকরে পড়ে আলো;
সত্যকে সে সত্য বলে, মিথ্যেকে কয় কালো।

শব্দ যখন অন্তঘুমে কবি তখন জাগে;
অনুভবের অন্তরাগে দাঁড়ায় সবার আগে।
বাতাসবেগে ভাবের বাহন চালায় মানবমূলে;
মুগ্ধতা পায় মাধুর্যমূল কবির কাব্যফুলে।

কবি হলো অন্ধতাপস সূর্যমুখো জল
কবির হাতে কাব্য ঘুমায়, স্নিগ্ধ সুনির্মল!
কবিত্বে যার নিগূঢ় সাধন যাপনে যার যতি
তার কাছেতেই স্থানু হয় বেভুল বনস্পতি।

কবি তো সেই দূরের তারা, কাছের মানুষ হয়ে;
কবির আকাশ নতজানু বিমূর্ত বিনয়ে।
কবির চরণ কোমল-কঠিন পথের ঘায়ে বাঁচে;
চন্দ্রালোকে হাঁটে কবি, সূর্যালোকের আঁচে!

কবির কাহন কবির বাহন, শব্দে ধরা দায়;
মহাবিশ্ব থমকে দাঁড়ায় কবির জানালায়!

প্র ব ন্ধ

The Eternal Mix Doubles on Bengali Silver Screen #US

Professor Debanjan Banerjee

"My dear, our souls met long before our eyes did" May be not happened in real, but, happened in reels. They were made for each other. The chemistry was unputdownable. The presence, the feelings, the improvisation, the perfection and the timing were mind-blowing, beyond script.

The genius duo of Bengali cinema. Yes, #US amader "Uttam – Suchitra" – the made for each other mixed doubles that triumphed the Bengali screen for more than two decades and took it on zenith.

Who can dare to forget the mild tune of the sweet and soft song wrapped in mawkish love, "Ogo tumi je aamaar... Ogo tumi je aamaar" (You are mine, only mine…) from the Bengali movie Harano Sur (Lost Melody) released in 1957 still buzzes pleasantries, not only inside the ears of millions, but also at the centre of millions mind.

Suchitra Sen and Uttam Kumar were considered the 'golden couple' of Bengali films from 1953 to 1978. They left their special identities by contributing the best of themselves through their marvellous acting endowment. When we reminiscence about some of the Bengali films featuring the superb acting of Uttam Kumar and Suchitra Sen from the depths of the memory, it seems as if both of them are standing before our eyes in all their romantic glory. Such is the power they evoked our emotions even today.

The eon of 'Uttam-Suchitra', the mid-1950s through the 1960s, is commonly designated as the 'golden period' of Bengali cinema, and has been reminisced and talked about extensively. During these years – Bengali directors were able to produce a genre of film melodrama that became crucial to a Bengali sense of self. Identification was rooted in the figures of an idealized female and an idealistic and principled male, embodied respectively by Suchitra Sen and Uttam Kumar, and their romantic love became the paraphernalia of intense emotional identification among Bengalis of the post-independence generation. The same prototypes were common in films of that era which did not actually feature Uttam Kumar and Suchitra Sen together, and it has been suggested that 'Uttam-Suchitra… be used as a sign 2 for the broader genre of the 1950s and 1960s popular melodrama. Though the Uttam-Suchitra films became the paradigm of romantic love for the generation.

1950s generation, they were much more than simple love stories. Notwithstanding its Hollywood-inspired quality, this genre was able to create an affective space that gave Bengalis – and especially middle-class Bengalis – a sense of charisma and elegance, which they imagined to be their very own. It made for a self-image, which though somewhat insular was also profoundly positive, and inspired a sense of 'feel-good' 'Bengaliness'

Against the hurriedly transforming backdrop of Bengali society, the world of Uttam and Suchitra signified the perfect balance of lastingness and change in Bengali life. It made for a new nous of modernity, and a sense of self which stood over and above the contemporary ideal of the nation.

After the screen demise of this dazzling duos many combinations came, many permutation mishmashes experimented on Bengali silver screen - in some cases with box office success too, but, the feelings failed to touch the heart of the audience resulted the eternity of #US Uttam – Suchitra….

About the Contributor

An author, columnist, editor, media educator and a television debater in politics and international relations. Presently, Dean - Media, Techno India Salt Lake Main Campus, Kolkata. Can be contacted at debanjan.mediaguru@gmail.com

প্র ব ন্ধ

ক্লারা বার্টন

রূপা মজুমদার

ইউরোপে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় আহত সৈনিকদের শুশ্রূষার জন্য নতুন নার্সিং পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল আর যুদ্ধকালীন সেই সেবিকার কাজের জন্য তিনি লেডি উইথ ল্যাম্প আখ্যায় ভূষিত হয়েছিলেন। এর আগে আহত সেনাদের জন্য সেবার কোন বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। তিনি শুধু সেনাদের সেবার দায়িত্বই নেননি, তার নিজের জীবন বিপন্ন করে রাতের বেলাতেও আলো হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরে বেড়াতেন। যদি কোন সৈনিক আহত অবস্থায় জীবিত থেকে থাকেন, যদি তার জীবন বাঁচানো যায় এমনই ছিল আহত মানুষদের জন্য তার মমত্ববোধ ।

এইরকমই আরেকজন স্বেচ্ছাসেবিকা ছিলেন মিস ক্লারা বার্টন।

আমেরিকার নর্থ অক্সফোর্ডের এক গণ্যমান্য কৃষক পরিবারের সবচেয়ে ছোট মেয়ে ক্লারা জন্মগ্রহণ করেন ১৮২১ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর। বাবা ক্যাপ্টেন স্টিফেন বার্টন ছিলেন প্রাক্তন সেনা, কৃষক এবং একজন সফল অশ্বব্যবসায়ী। ছেলেবেলা থেকেই লেখাপড়ার সঙ্গে খেলাধুলা, ঘোড়ায় চড়া সবেতেই পারদর্শী ছিলেন ক্লারা। পড়েছিলেন দর্শনশাস্ত্র রসায়নবিদ্যা ও ল্যাটিন ভাষা।

ছেলেবেলা থেকেই বাবার কাছে শুনতেন যুদ্ধক্ষেত্রের নানা গল্প, সেনাদের আত্মত্যাগের গল্প, যুদ্ধে আহত হয়ে উপযুক্ত সেবার অভাবে কষ্ট পাওয়ার কথা, সময়মতো ত্রাণ সামগ্রী না মেলায় খাদ্যাভাবে কষ্ট পাওয়ার কথা, মৃত সেনাদের দেহ খুঁজে না পাওয়ার কথা, তাদের পরিবারের মানুষের অসহায়তার কথা। শুনতে শুনতে ধীরে ধীরে সেবার মনোবৃত্তি তৈরি হতে থাকে ক্লারার। তার এই সেবার মনোবৃত্তি পরিচয় পাওয়া গেল প্রথমে নিজের বাড়িতেই। একদিন দাদার ডেভিড গোলাবাড়ির চাল সরাতে গিয়ে মাটিতে পড়ে সাংঘাতিক চোট পেল ডাক্তাররাও ডেভিডের ভালো হয়ে ওঠার আসা ছেড়ে দিলেন। আশা ছাড়লেন না ১১ বছরের ক্লারা। সব কাজ সরিয়ে রেখে দৃঢ় সংকল্পে দাদাকে সেবা করতে লাগলেন। ডাক্তারদের ধারণা ভুল প্রমাণ করে অতন্দ্র সেবায় দাদাকে সুস্থ করে তুললেন। ডাক্তার ব্যাপারটাকে মিরাকেল আখ্যা দিলেন।

এভাবেই শুরু হল আজীবন সেবার কাজ। মাত্র ১৭ বছর বয়সেই মাসাচুসেটস ওরসিস্টার কান্ট্রি স্কুলে শিক্ষিকা চাকরি পান। ১০ বছর চাকরি করার পর আঙ্খ রও পড়াশোনা করার জন্য অ্যান অ্যাডভান্স স্কুল ফর ফিমেল টিচার্স-এ ভর্তি হন। এখানে থাকতেই ফরাসি ভাষা শিখতে শুরু করেন এবং পত্রপত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন। পড়া শেষ করে শিক্ষিকার চাকরি নিয়ে চলে যান নিউ জার্সি। সেখানে বাড়ির কাছে নিজে একটা অবৈতনিক স্কুল খুললেন যেখানে ছাত্র সংখ্যা অচিরেই ৬০০ ছাড়িয়ে গেল। এই সময়ে স্কুল বোর্ড একজন মহিলাকে প্রধানের পদে না রেখে একজন পুরুষ শিক্ষককে সেই পদে বসানোর সিদ্ধান্ত নিলেন, প্রতিবাদে কাজ ছেড়ে ক্লারা ওয়াশিংটন ডিসিতে ফিরে গেলেন। সেখানে যোগ দিলেন পেটেন্ট অফিসে পেটেন্ট কমিশনার পদে , কিন্তু এখানেও দেখা দিল সেই একই সমস্যা । এমন একটা উঁচু পদে একজন সামান্য মহিলা পুরুষ সহকর্মীর সমান বেতন নিয়ে কাজ করবেন সেটা অনেকের মনঃপূত হলো না। অতএব রাজনৈতিক চাপে তাকে কমিশনার থেকে একেবারে কেরানির পদে নামিয়ে দেওয়া হলো। আসলে ক্লারা ছিলেন ক্রীতদাস প্রথার বিরোধী আর পেটেন্ট অফিসার কর্তাব্যক্তিরা ছিলেন দাস প্রথার পক্ষপাতি। এটাই তার পদাবনতির কারণ। চার বছর সেখানে কাজ করার পর ১৮৬০ সালে তিনি ওয়াশিংটন ছেড়ে চলে যান।

ইতিমধ্যে ১৮৬১ সালে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। ক্লারা নিজের কাজ ছেড়ে দিয়ে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে যুদ্ধের ফ্রন্টে তার কাজ শুরু করলেন। যুদ্ধে আহত বিদ্ধস্ত সেনাদের সেবাই তখন তার ধ্যানজ্ঞান। হাতের কাছে খাদ্য তুলো ব্যান্ডেজ তোয়ালে রান্নার জ্বালানি কিছুই ছিল না। তবুও তিনি তার সামান্য যা নিজের ছিল আর কিছু নাগরিকদের কাছ থেকে চেয়ে চিনতে জোগাড় করতে পেরেছিলেন। তাই দিয়ে আহতদের সেবার কাজে লাগালেন। পুরনো চাদর ছিড়ে ব্যান্ডেজ বানাতেন, বড় টুকরো করে তোয়ালে হিসেবে ব্যবহার করতে নিতেন, অবশিষ্ট অবহার্য অংশ রান্নার কাজে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করতেন। দৈনন্দিন সামগ্রীর জন্য সাধারণ জনগণের কাছে আবেদন রাখতে শুরু করলেন। বিখ্যাত 'প্রথম বুল রান' যুদ্ধের পর সৈন্যদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাবের বিষয় বিশেষ রিপোর্ট পেয়ে তিনি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে যুদ্ধে আহত সেনাদের ও ক্ষতিগ্রস্ত সাহায্যের জন্য মানুষের কাছে আবেদন রাখলেন।

ক্লারার এই আকুল আবেদনের ফল মিলল হাতে না হাতে। এত সাহায্য আসতে শুরু করলো যে তা ঠিকঠাকভাবে রাখার জন্য এবং বিতরণের জন্য সঙ্গীদের নিয়ে একটা সংস্থা খুললেন। প্রমাণ করলেন মানুষের সেবার কাজের জন্য কখনো অর্থের অভাব হয় না, শুধু প্রয়োজন আন্তরিক ইচ্ছা ও সুযোগ খুঁজে নেওয়ার সদিচ্ছা। স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরে ঘুরে আহত সেনাদের যথাসাধ্য প্রয়োজনীয় জিনিস যোগাতেন এবং নিজের হাতে আহতদের শুশ্রূষাও করতেন।

কাজটা তিনি করতেন কোন সরকারি সাহায্য ছাড়া। একবার এরকম এক সেনাকে ব্যান্ডেজ বাধার সময় একটি গুলি এসে তার জামার হাতায় লাগে। একটুর জন্য তিনি বেঁচে যান, তবুও তিনি কখনো ভয় যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া বন্ধ করেননি।

শুধু সেবা করেই ক্লারা থেমে থাকেননি। মৃত নিখোঁজ সেনাদের খবর খুঁজে বার করে আত্মীয়দের কাছে পৌঁছোবার কাজ শুরু করলেন। যুদ্ধ শেষে প্রেসিডেন্টের নির্দেশে একটি 'হারানো মানুষের দপ্তর' খুললেন, এইখানে তিনি হারানো সেনাদের খুঁজে পাওয়ার জন্য এক অভিনব কায়দা তৈরি করলেন। সেটা হল চিঠি লেখা অভিযান। উত্তরে তার কাছে হারানো স্বজনদের খুঁজে দেয়ার জন্য বিভিন্ন দিক থেকে প্রচুর আবেদনপত্র আসতে লাগলো। গৃহযুদ্ধের সময় জর্জিয়াতে ইউনিয়ন পক্ষের যেসব সেনাবন্দি ছিলেন ও যারা বন্দী অবস্থয় মারা যান তাদের খোঁজে সরেজমিনে তদন্ত করতে তিনি নিজেই জর্জিয়া যান ও ইউনিয়ন পক্ষের হাজার হাজার মৃত সেনার অচিনহিত গণকবর খুঁজে বার করেন। তার মধ্যে প্রায় ১৩০০০ সেনা তীব্র শীতে অসুখে ও খিদেয় মারা গিয়েছিলেন। ক্লারা সেই হতভাগ্য সেনাদের নামের তালিকা খবরের কাগজে ছাপতে থাকেন । এর ফলে অনেক পরিবার তাদের হারানো মানুষের খোঁজ পায়। ঐতিহাসিকরা বলেন একক চেষ্টাতেই ১৮৬৭ সালে ওই অফিস বন্ধ হওয়া পর্যন্ত ৬৩১৮৩ জনের চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন তিনি এবং প্রায় ২২০০০ হারানো মানুষের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল। নিখোঁজ সেনাদের মা, স্ত্রী

ও ছেলেমেয়েদের অসহায় অবস্থা লক্ষ্য করে তিনি তাদের সুরক্ষা ও অধিকারের জন্য সরব হন। মেয়েদের অধিকারের জন্য সংগঠন তৈরি করেন।

অপরিসীম পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েন ক্লারা। যুদ্ধের শেষে ডাক্তারের নির্দেশে স্বাস্থ্যের কারণে ইউরোপ যেতে হয়। কিন্তু সেখানে গিয়েও জড়িয়ে পড়লেন যুগান্তকারী কাজের সঙ্গে। ফ্রান্স ও জার্মানির সংঘর্ষের সময় খুব কাছ থেকে দেখলেন জেনেভা চুক্তির উপকারিতা এবং আন্তর্জাতিক সেবা সংস্থা রেড ক্রসের কাজ। আমেরিকায় রেড ক্রস প্রতিষ্ঠা করার এবং জেনেভা চুক্তিতে আমেরিকাকে সই করানোর প্রতিজ্ঞা নিয়ে দেশে ফেরেন ক্লারা ।

দেশে ফিরে লাগাতার চেষ্টা চালিয়ে ১৮৮১ সালে আমেরিকায় ন্যাশনাল সোসাইটি অফ রেড ক্রস গঠন করেন এবং আমেরিকা ১৮৮২ সালে জেনেভা চুক্তিতে সই করে। শুরু থেকে ১৯০৪ পর্যন্ত রেড ক্রসের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তার কার্যকালে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের ইতিহাসে আমেরিকা গুড সাভারিটিন অফ নেশনস আখ্যায় ভূষিত হয়।

তার তত্ত্বাবধানে ১৮৮১ সালে ৪ঠা সেপ্টেম্বরে অসামরিক ক্ষেত্রে ত্রাণ পাঠানো হয় মিশিগানের ভয়ংকর দাবানলের ক্ষতিগ্রস্ত ৫০০০-এর ওপর মানুষকে। পাঠানো হয়, ১৮৮৯ সালে ৩১ শে মে আমেরিকার জনস্টাউন বন্যা কবলিত অঞ্চলে এবং তৃতীয়বার ১৮৯৩ সালে ২৭শে আগস্ট সাউথ ক্যারোলিনার সমুদ্র দ্বীপগুলিতে যেখানে ভয়ংকর হারিকেনে ৩০০০০ মানুষ গৃহহারা হয়েছিলেন।

এইরকম বহু ত্রাণ কার্যে ক্লারা নিয়োজিত করেছিলেন নিজেকে। অবশেষে ১৯০৪ সালে প্রেসিডেন্টের পর থেকে ইস্তফা দেন তিনি।

তারপর আরো আট বছর জীবিত ছিলেন কর্মক্ষম অবস্থায়। ১২ই এপ্রিল ১৯১২ সালে সামান্য অসুখে কারোকে সেবা করার সুযোগ না দিয়েই মারা যান। তার লেখা বইগুলোর মধ্যে অন্যতম 'হিস্ট্রি অফ দি রেড ক্রস', 'রেড ক্রস ইন ওয়ার এন্ড পিস', 'দি স্টোরি অফ মাই চাইল্ডহুড'।

১৯৭৫ সালে তার স্মৃতিতে সম্মান জানিয়ে 'ক্লারা বার্টন ন্যাশনাল হিস্টোরিক সাইট' স্থাপিত হয় তার মেরিল্যান্ডের বাড়িতে। আমেরিকায় কোন মহিলাকে এমন সম্মান দেখানো সেই প্রথম। তার মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই ডেট্রয়েট ফ্রী প্রেস পত্রিকায় তার সঠিক মূল্যায়ন করে লিখেছিল বর্তমানকালের যুদ্ধ আর যোদ্ধারা জেনেছে—

'তিনি একমাত্র তিনিই ছিলেন ক্ষমা ও করুণার সম্পূর্ণ প্রতিমূর্তি।'

রান্নাবান্না

বাহারী রান্না

শর্মিষ্ঠা দে

কমলা-সুফলে

উপকরণ ঃ ডিম—৪টে, ক্যাস্টর সুগার—১২৫ গ্রাম, কমলালেবুর খোসা ও রস, ১টা কমলালেবু (কুচনো), ড্রিঙ্কিং চকোলেট—১ টেবিল চামচ, প্লেন চকোলেট—৫০ গ্রাম (গলানো), ডাবলক্রিম (ফেটানো)—৩০০ মিলি, সাজানোর জন্য—চকোলেটের তৈরি পাতা, লম্বা করে কাটা কমলালেবুর খোসা।

প্রণালী ঃ একটি কানা উঁচু সুফলেডিশ নিন। সুফলে ডিসের ভিতরের চারধারে দু-ভাঁজ পাট করা কয়েল অথবা মাখন লাগানো কাগজ এমনভাবে রাখুন যাতে পাত্রের উপরদিকে সেটা দুই উঁচু হয়ে থাকে, একটা পাত্রে ডিমের কুসুম, চিনি লেবুর খোসা কুরনো দিয়ে ফেটান, মিশ্রণটা বেশ ঘন হয়ে উঠবে। একটা কাপে ড্রিঙ্কিং চকোলেট ও লেবুর রস দিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। গলানো চকোলেটের মধ্যে পেস্টটা দিয়ে নেড়েচেড়ে পুরোটা ডিমের মিশ্রণে ফেটিয়ে নিন। অন্য একটা পাত্রে ডিমের সাদা অংশ দিয়ে ফেটাতে থাকুন। দেখবেন এটা বেশ শক্ত হয়ে উঠবে। এটা চকোলেটের মিশ্রণের মধ্যে আস্তে আস্তে দিতে থাকুন। সঙ্গে ক্রিমও দেবেন। সুফলে ডিশ-এ এই মিশ্রণটা ফ্রিজে মিনিট পনেরো রাখুন। এর মধ্যেই ওটা জমে যাবে। পরিবেশন করার আগে ফ্রিজ থেকে বার করে একটু গরম করে নেবেন। তৈরি হল সুফলে, সুফলের উপরে চকোলেট ও লেবুর খোসা কুরোনো দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

ম্যাকারুন টার্ট

উপকরণ ঃ ম্যাকারুন টার্ট—১৫০ গ্রাম মাখন, ১০০ গ্রাম চিনি, ৩৫০ গ্রাম ময়দা, ৩টি ডিম।

ব্যাটারিং ঃ ১০টি ডিম, ২৫০ গ্রাম ডিমের সাদা অংশ, ২০০ গ্রাম চিনি, ৩০০ গ্রাম কাজুবাদাম, আধকাপ কোকো।

চকোলেট সস টপিং ঃ ১ কেজি চকোলেট, দেড় চামচ হালকা ফ্রেশ ক্রিম।

প্রণালী

ম্যাকারুন টার্ট ঃ ১। প্রথমে মাখন আর চিনি একসঙ্গে ফেটিয়ে নিন। ২। আস্তে আস্তে ডিম ও ময়দা অল্প অল্প করে মেশান, একটি মিশ্রণ বানানোর জন্য। ৩। টার্ট বানাবার ছাঁচে ঢেলে তৈরি করুন।

ম্যাকারুন ফিলিং ঃ ১। ডিমের সাদা অংশ এবং চিনি একসঙ্গে ফেটিয়ে নিন। ২। এই হালকা হয়ে যাওয়া মিশ্রণে মিহি করে কুচোনো কাজুবাদাম আর কোকো মিশিয়ে মিশ্রণটি প্রস্তুত করুন। ৩। আগে থেকে সেট করে রাখা টার্টের ওপর ফিলিং মিশ্রণ ঢালুন। ৪। আবার এই টার্টগুলো প্রিহিট বেকিং অভেনে ২১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ৪০ মিনিট বেক করুন। ঠাণ্ডা হতে দিন।

ব্যাটারিং

১। ডিম, মাখন, চিনি আর কোকো আস্তে আস্তে মিশ্রণ বানিয়ে আইসিং পাইপ দিয়ে গোলাকার টপিং করুন। ২। মাঝের গোল জায়গা ফাঁকা রাখুন চকো সস ঢালবার জন্য।

চকোলেট সস টপিং

১। চকোলেট আর ফ্রেশ ক্রিম একসঙ্গে মিশিয়ে মিশ্রণ বানান। ২। সেটা গোলাকার ফাঁকা জায়গায় ঢালুন। ৩। ফ্রিজে ঠাণ্ডা হতে দিতে হবে ১৫ মিনিট। আপনার ম্যাকারুন টার্ট তৈরি।

ভেজিটেবল পাঁপড় রোল

উপকরণ ঃ পাঁপড় ঃ ৮টি গাজর, ১টি (কুঁচি) আলু ঃ ১টি (টুকরো করা) বিনস ঃ ৬টি, ফুলকপি ঃ ১০০ গ্রাম, হলুদ হাফ চা চামচ, লঙ্কার গুঁড়ো হাফ চা চামচ, ধনেপাতা ঃ ১ আঁটি, নুন, সাদা তেল ঃ ভাজার জন্য।

প্রণালী

সমস্ত সবজি টুকরো করে কেটে নিন। আলু, গাজর, বিনস্, ফুলকপি সামান্য নুন দিয়ে সিদ্ধ করে নিন ও জল ঝরিয়ে নিন।

প্যানে ১ টেবিল চামচ তেল দিয়ে তাতে সবজি দিন ও সতে করে নিন। হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো দিন ও মিশিয়ে নিন।

সবশেষে দিন ধনেপাতা কুঁচি ও একদম ঠাণ্ডা করে নিন।

পাঁপড় জলে ডুবিয়ে তুলে নিন। একটি প্লেটে রেখে মাঝখানে সবজির পুর ভরে পুরোটা রোল করে নিন। এবারে দুই প্রান্ত চেপে সিল করে দিন।

কড়াইতে অনেকটা তেল দিন। পুর ভরা পাঁপড় এতে সোনালী করে ভেজে তুলুন।

শামি কাবাব

(৫-৬ জনের জন্য)

উপকরন ঃ হাফ কাপ ছোলার ডাল, ১টি মাঝারি সাইজের পিঁয়াজ, ৩টি কাঁচা লঙ্কা, ৩ কোয়া রসুন, হাফ ইঞ্চি আদার টুকরো, ৪টি গোল মরিচ, ৫০০ গ্রাম মাংসের কিমা, ১/৪ চা-চামচ লঙ্কাগুঁড়ো, নুন স্বাদ অনুযায়ী, ১/৪ চা চামচ জিরে, হাফ চা-চামচ দারচিনি গুঁড়ো, ৪টি লবঙ্গ, ১/৪ চা চামচ লেবুর খোসা গুঁড়ো।

প্রণালী ঃ সারা রাত ডাল ভিজিয়ে পিষে নিন। আধখানা পিঁয়াজ, আদা ও রসুন কুচি করুন, বাকিটা পিষে নিন। ডাল, মাংসের কিমা ও সব মশলা (কুচি করা মশলা ও লেবুর খোসা বাদে) ভালো করে একসঙ্গে মিশিয়ে লেই করুন। মিশ্রণটি ছোট ছোট ভাগে ভাগ করুন ও বাটা মশলা এবং লেবুর খোসা গুঁড়ো প্রত্যেকটির মধ্যে ভরুন। প্রত্যেকটি ভাগ আলাদা আলাদা ভাবে চ্যাপ্টা কেকের মতো করে নিয়ে বাদামী রঙ না ধরা পর্যন্ত ভাজুন। কাঁচা পিঁয়াজের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

পাইনঅ্যাপেল চিকেন

উপকরণ ঃ ৪৫০/৫০০ গ্রাম হাড় ছাড়ানো ছোট টুকরো করে সেদ্ধ করা মুরগির মাংস, ১ টেবিল চামচ এরারুট, ১ টেবিল চামচ সয়া সস, ১ কাপ লম্বা করে কাটা পেঁয়াজ কুঁচি, ১ কাপ লেটুস পাতা কুঁচি, ১ কাপ গাজর কুঁচি সেদ্ধ করা, ১টা আনারস ছোট করে কেটে সেদ্ধ করা, ১/৪ চা চামচ আজিনামটো, নুন দিয়ে একসঙ্গে ভেজে নিন। গাজর আর লেটুস পাতা ইচ্ছে করলে বাদও দিতে পারেন।

পোটেটো কাট্‌লেট্

(৮-১০ জনের জন্য)

উপকরণ ঃ ১/২ কেজি আলু, ২ বড় চামচ দুধ, ২ বড় টুকরো মাছ বা মাংস, ২ বড় চামচ ওটমিল বা পাঁউরুটির গুঁড়ো, নুন ও মরিচ স্বাদ অনুযায়ী, ১ চা-চামচ ওরস্টার বা টোমাটো সস, ভাল ঘি বা বাদাম তেল।

প্রণালী ঃ আলু সিদ্ধ করে চালুনীর মধ্যে দিয়ে রগড়ে ছেঁকে নিন। মাংস বা মাছ সিদ্ধ করুন (যদি মাছ ব্যবহার করেন তবে ছাল ছাড়িয়ে কাঁটা বেছে নিন। মাংস ব্যবহার করতে মিহি কিমা করুন)। নুন ও মরিচ দিয়ে মাখুন। মাছে টোমাটো সস দিন আর মাংস হলে দিন ওরস্টার সস। আলু ভেজানোর জন্যে একটু দুধ দিন এবং ছোট বলের আকারে গড়ে বেলে নিন। সামান্য মাছ বা মাংস মাঝখানে রেখে কাটলেটের আকারে গড়ুন। কাটলেট গুলিতে ওটমিল বা পাঁউরুটির গুঁড়ো মাখিয়ে নিন ও গরম ঘি বা বাদাম তেলে সমান বাদামী করে ভাজুন। তেল বা ঘি ভালোভাবে মাখিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

গল্প

পতঙ্গ

শুভমানস ঘোষ

প্রচণ্ড গরমে ঘরে ঘরে এসির দৌরাত্ম্যে ট্র্যান্সফর্মার পুড়ে যাওয়ায় সন্ধে থেকে কারেন্ট নেই। বসে বসে সিদ্ধ হচ্ছি। ঘেমেনেয়ে একশা। স্রোতের মতন বুক-পিঠ বেয়ে ঘাম গড়াচ্ছে আমার। বিছানা চটচট করছে। থেকে থেকে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের লোকদের কাছে খোঁজ নিচ্ছি, কাজ কত দূর।

কিন্তু তারা কোনও আশার বাণীই শোনাতে পারছে না। এমন ভাবে ট্র্যান্সফর্মার পুড়ে গেছে সময় লাগবে। শুনে গায়ে যেন ছ্যাঁকা লাগছে। টেম্পারেচার অলরেডি তেতাল্লিশ ডিগ্রি ফারেনহাইট ছাড়িয়ে চুয়াল্লিশের দিকে রান করছে। এসিকাতর মানুষের পক্ষে অমানুষিক কষ্টের। "জ্বলেপুড়েই মরব মনে হচ্ছে!" বলে গজগজ করতে করতে ঘরে এসে ঢুকেই স্ট্যাচু হয়ে গেলাম।

ঘরে একটু জায়গা জুড়ে একতাল জমাট অন্ধকার মানুষের মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি "কে? কে?" করে আর্তনাদ করতেই সে বলল, "এতেই মরে যাচ্ছ? তা হলে কতটা গরম আমায় সইতে হয়েছে এক বার ভাবো।"

গলাটা শুনেই বুঝলাম আমার মৃত স্ত্রী মৌমণি। মৌমণি দেখতে-শুনতে বেশ ভাল ছিল। বিয়ে করে ঘরে তুলতে লোকজন বলেছিল, পাড়ার সেরা বউ।

কথাটা মাথায় গেঁথে গেছিল মৌমণির। বিয়ের পর থেকে নাম্বার ওয়ান পজিশনটা ধরে রাখতে রূপচর্চার পেছনে অকাতরে খরচ করেছে। তাতে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে বলে হালকা করে গলা তুললেই ছেলে রে রে করে উঠত। মায়ের হয়ে বলত, "মা-কে এ ভাবে বলবে না! মা যা চাইছে দিয়ে দাও না!"

মায়ের ধারায় ছেলেও আমার সুন্দর দেখতে। বন্ধুরা তাকে ঋত্বিক রোশন নাম দিয়েছে। তার জন্য সে মায়ের কাছে এতটাই কৃতজ্ঞ যে আমায় একবিন্দু ক্রেডিট দিতে রাজি নয়। মা-ও তাতে আনন্দের সঙ্গে সায় দিয়ে এমন ভাবে আমাকে দেখত আমি যেন বাঁদর। সে আমার গলার মুক্তোর হার।

ফলে যত বয়েস বাড়ছিল তত নার্ভাস হয়ে মৌমণি রূপচর্চার পেছনে আরও বেশি করে সময় ও অর্থ ব্যয় করতে শুরু করেছিল।

ছেলের বিয়ের পর সেটাই কাল হয়েছিল। মৌমণির চেয়েও সুন্দর বউ ঘরে এনেছিল ছেলে। তাকে দেখতেও পাড়ার লোকেরা হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। ধন্য ধন্য পড়ে গেছিল ছেলের পছন্দের। এমন ডানাকাটা পরি ভাগ্য করেই মেলে বলে আনন্দ করে ভোজ খেয়ে যে-যার বাড়ি ফিরে গেছিল।

তখন থেকেই সমস্যা শুরু মৌমণির। কথায় কথায় ছেলের বউয়ের সঙ্গে তার লেগে যেত। যত সুন্দর ছেলে হোক, বউয়ের মায়া বড় মায়া। ছেলেও আস্তে আস্তে সরে আসতে থাকে মায়ের কাছ থেকে। তখনই সর্বনাশ ঘনিয়ে আসে মৌমণির। রূপচর্চার বাড়াবাড়ির ফল মুখময় শ্বেতীর দাগ হয়ে ফুটে ওঠে তার। ব্যঙ্গে-আনন্দে মুখ বেঁকে যায় ছেলের বউয়ের। জয়ের আনন্দে আরও তীব্র ভাবে মুখর হয়ে ওঠে সে।

সর্বস্ব হারিয়ে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে মৌমণির। ঘরের ভেতর নিজেকে লুকিয়ে ফেলে। বাইরের লোকের কাছে মুখ দেখানো বন্ধ করে দেয়। আমায় ঠেলে ঠেলে পাঠাতে থাকে ডাক্তারের কাছে।

কিন্তু লাভ হয় না। কোনও কিছুতেই কিছু হচ্ছে না দেখে মৌমণি এতটাই হতাশ হয়ে পড়ে, বেঁচে থাকার দম হারিয়ে ফেলে। বাথরুম আটকে দরজায় হেলান দিয়ে বসে কেরোসিন তেল গায়ে ঢেলে আগুন দিয়ে মরে বাঁচে।

এখন দেখছি মৌমণি বাঁচেনি। আমি চুপ করে আছি দেখে বলল, "কী হল? কথা বলছ না কেন?"

আমি স্তম্ভিত, "তুমি তো চলে গেছিলে, এলে কী করে?"

মৌমণি বলল, "যে-কষ্ট আমি পাচ্ছি, কারেন্ট যেতে সেই কষ্ট তো তুমিও পাচ্ছ। তাই তো আসতে পারলাম।"

"বুঝলাম।"

"কিছুই বোঝোনি," মৌমণি জুড়ল, "সারা জীবন নিজেকে দেখেছি, তোমায় তো দেখিনি। অবহেলা করেছি তোমাকে। তার জন্য আজও আগুন নেভেনি। এখনও জ্বলছে।"

আমি অবাক, "নেভেনি মানে? আমিই তো দরজা ভেঙে তোমাকে উদ্ধার করেছিলাম। আগুন নিভিয়েছিলাম।"

"নেভেনি! নেভেনি," মৌমণি বলল, "তুমি ক্ষমা করে জড়িয়ে না-ধরলে এ আগুন নিভবে না।"

মৌমণি এগিয়ে এল। মুখটা আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে এল। দেখলাম সত্যিই আগুন নেভেনি। তার উত্তাপে মুখে শ্বেতীর অসহ্য দাগগুলো পুড়ে-জ্বলে গেছে। আবার সে আগের মতো সুন্দর ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে।

বুঝলাম আর ওকে রোখা যাবে না। সারা জীবন ও যা চেয়েছে নির্দয়ভাবে আদায় করে ছেড়েছে। এ বারও ছাড়বে। আমাকে পুড়িয়ে-জ্বালিয়ে গায়ের আগুন নিভিয়ে তবে যাবে।

কিন্তু আমি তো মৌমণি নই, নেহাতই রূপহীন পুরুষ। কাজেই বিয়ের পরে ঠিকরে-যাওয়া চোখ নিয়ে যে-ভাবে তাকিয়ে থাকতাম, চেয়ে রইলাম অপলকে।

"কী দেখছ আমার দিকে? বড় জ্বালা গো! মরে ভেবেছিলাম, বাঁচলাম। কই? আর তো মরতে পারব না। আর পারছি না। একটু ভালবেসে জড়িয়ে ধরো না! একটু ঠান্ডা করো আমাকে।" মৌমণি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

মৌমণি কাঁদছে? স্বামী আছে না নেই যে নারী খেয়ালই রাখত না, এমনকী, আমার সুন্দর সন্তানের জন্য ছেলের দেখাদেখি আমার কন্ট্রিবিউশনকে একচুলও স্বীকৃতি দেয়নি, সে-ও কাঁদে? আকুলভাবে পরের কাছে ভালবাসা প্রার্থনা করে?

আমি এতটাই অবাক হয়ে গেলাম ভুলেই গেলাম মৌমণির কাছে জীবনভরের অপমানের প্রতিবিধান করার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। কাজেই পুরুষের যা নিয়তি, উল্টে "আহা রে! খুব কষ্ট হচ্ছে?" বলে এ বার আর জল নয়, সব ঘাম তার গায়ে উজাড় করে ঢেলে জড়িয়েই ধরলাম তাকে।

ক্যুইজ-১

সঞ্জীবকুমার দে

১) ক্রিকেট-বিশ্বে জিম্বাবুয়ে দেশটির নাম কারও অজানা নয়। বিখ্যাত ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের জন্যও আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের এই দেশ বিশেষভাবে খ্যাত। ১৯৮০ সালে জিম্বাবুয়ে নামকরণের আগে এই দেশটি কি নামে পরিচিত ছিল?

২) ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা (USA) কতগুলি স্টেটস (রাজ্য) নিয়ে গঠিত?

৩) জীবজগতে শব্দ করতে পারে না যে প্রাণী, তাঁর বৈজ্ঞানিক নাম (Scientific Name) কী?

৪) ১৯৮২ সালে স্পেনে আয়োজিত বিশ্বকাপ ফুটবলে গোল্ডেন বুট ও গোল্ডেন বল দুটোই গিয়েছিল তাঁর ঝুলিতে। বিশ্ব সেরা খেতাব পেয়েছিল তাঁর দেশ ইতালি। কে সেই ফুটবলার?

৫) কিংবদন্তি গায়ক কিশোরকুমারের প্রকৃত নাম কী?

৬) হাঞ্চব্যাক অফ নোৎরদাম, টয়লারস্ অফ দ্য সী, লাফিং ম্যান, প্রভৃতি অমর উপন্যাসের রচয়িতা ফরাসী সাহিত্যিক ভিক্টর মারি হুগো-র আরেক বিখ্যাত উপন্যাস 'লা মিজারেবল্'-এর প্রধান চরিত্রের নাম কী?

৭) বাংলা সাহিত্যে আমরা একই নামের দুই বিখ্যাত সাহিত্যিকের দু'টি অম্লান চরিত্র অপু ও রানু-কে পাই। একজন সাহিত্যিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অপরজন মুখোপাধ্যায়। দু'জনের নাম কী?

৮) হিন্দু পুরাণে আমরা আরো একজন রামের বর্ণনা পাই। যিনি পরশুরাম নামে পরিচিত। বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার রূপে যিনি আখ্যায়িত। শিবের কাছ থেকে যিনি সমস্তরকম যুদ্ধকলা শিক্ষা নিয়েছিলেন এবং জগতের সমস্তরকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সংকল্প নিয়ে শিবের পরশু উপহার পেয়েছিলেন। এই 'পরশু' কি?

৯) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

১০) ভারতের মিজোরাম রাজ্যের লুসাই পাহাড় থেকে প্রবাহিত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম দিয়ে বয়ে এসে যে নদী বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রামে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে, সে নদীর নাম কি?

উত্তর ঃ ১৪ পাতায়

গল্প

অকম্মা মা

দীপান্বিতা রায়

বাসন-কোসন মেজে, রান্নাঘর নিকিয়ে আর সব কাজ সেরে বাইরে এসে মালা দেখল দুপুরের আলো নারকেল গাছের পাতার ওপর ঝিকমিক করছে। বেলা অন্তত দুটো। শীতের দিন। দ্যাখ না দ্যাখ সূর্যের আলো মরে গিয়ে আঁধার নামবে। তার আগে আরও অনেক কাজ আছে। গরুগুলো গোয়ালে ফিরবে। তাদের জাবনা মেখে রাখতে হবে। কোচানো খড় যদি না থাকে, তাহলে তাও খানিক কুচিয়ে রাখা দরকার। মেয়েরা ফিরবে ইস্কুল থেকে। খেতে দিতে হবে। আগে ঘরে ঘরে কেরোসিনের লম্ফ কিংবা হারিকেন জ্বালাও একটা কাজ ছিল। ইদানীং অবশ্য ইলেকট্রিক এসেছে। দুটো ঘরে আর সামনের বারান্দাটায় আজকাল আলো জ্বলে। রান্নাঘরেও একটা আলো লাগিয়ে দিলে মালার সুবিধা হয় কত। অন্ধকারে কোটো-বাটা হাঁটকাতে হয় না। কিন্তু সেকথা কে শুনবে? শাশুড়ি বলে দিয়েছে, রান্নাবান্না তো সব সকালেই সারা হয়ে যায়। রাতে শুধু খেতে দেওয়া কাজ। ওরজন্য বিজলির টাকা পোড়ানোর কোনও দরকার নেই। বরং একখানা টেবিলফ্যান কিনে রাখ। গরমের দিনে কাজে লাগবে।

শাশুড়ি যা বলবে, তাঁর ছেলেও তাই শুনবে, জানে মালা। টেবিলফ্যান কেনা হলে সেখানাও যে উনি নিজের মাথার কাছে নিয়ে হাওয়া খাবেন, তাও জানে। অনেককাল দেখছে তো। তাই আর কথা বাড়ায়নি। কিন্তু সেসব তো নয় পরের কথা পরে। এখন বড্ড ক্লান্ত লাগছে তার। শরীরখানা যেন ভেঙে আসছে। আজকে সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার সময়ই গা-টা ম্যাজম্যাজ করছিল। দুপুরে গায়ে জল ঢেলেও আরাম হয়নি মোটেই। কী জানি জ্বর-জারি হল কীনা? ভাবতে ভাবতে দাওয়ায় রাখা চৌকিখানায় পাতা মাদুরের ওপর গা এলিয়ে দেয় মালা। রোদ এসে পড়েছে গায়ে। ওম হচ্ছে দিব্যি। দিন-দুপুরে বউমানুষ গা এলিয়ে ঘুমুচ্ছে দেখলে শাশুড়ি এখনই চ্যাটাং চ্যাটাং করে কথা শোনাবে জেনেও চোখ বুজে আসে মালার। মনে মনে ভাবে বলুক না হয়। কত আর বলবে। সারাজীবন তো শুনেই আসছি।

সত্যি বলতে কী বিয়ের আগের জীবনটার কথা এখন আর যেন তেমনভাবে মনেই পড়ে না তার। এই সরপুকুরডাঙা থেকে পূবদিকে মাইলদশেক গেলেই বাপের বাড়ির গ্রাম মলনদিঘি। পাকা রাস্তা অনেককালই আছে। এখন তো রুটের

বাস যাচ্ছে একঘণ্টা অন্তর। তাও দু-বছরে একবার বাপের ঘর যাওয়ার সুযোগ হয় না । সারাটাদিন যেন এই বাড়ির কাজের চাকায় বাঁধা। অথচ বিয়ের আগে কিন্তু অবস্থাটা ঠিক এরকম ছিল না। তার বাপও যে বড়মানুষ তা নয়। চাষী-বাসী লোক। নিজের কিছু জমি-জিরেত আছে। ঘরে হাল-বলদ। হালের মুঠ ধরে নিজেই মাঠে নামে। ধান রোয়ার সময় মায়ের সঙ্গে তারা দুই বোনও যেত চারা রুইতে। তাছাড়া বাড়ির কাজকর্ম, গরু বাছুরের দেখাশোনা, ধান সেদ্ধ, ঘর নিকানো এসব তো ছিলই। ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল বাবা। দশক্লাস পর্যন্ত পড়েছে মালা। পরীক্ষা যদিও দেওয়া হয়নি কিন্তু ছাপার বই পড়তে পারে দিব্যি। ইস্কুল থেকে ফিরে মায়ের হাতে-হাতে কাজ করত। কখনও বিরক্তি লাগেনি। আসলে গরীবের ঘর। খাটুনি থাকলেও আদর ছিল। বাবা চাষ দিয়ে দুপুরবেলা ফিরে রোদে পিঠ দিয়ে বসলে তেলের বাটি নিয়ে বসত মালাও। ঘষে ঘষে পিঠে তেল লাগিয়ে দিত। বাবা হেসে বলত,

আহা, আমার মালা মায়ের হাতখানা কী নরম ! শরীর যেন জুড়িয়ে যায়।

ঠাকমাবুড়ি গরমের দিনে দাওয়ায় চৌকিতে দু-বোনকে দুপাশে শুইয়ে গল্প বলতো। শুনতে শুনতে ঘুম এসে যেত মালার। চাঁদনি রাত। ঠান্ডা হাওয়া। বাতাসে ভেসে আসা লেবু ফুলের গন্ধ। সব মিলিয়ে ছোট্ট মনটা একদম ভরে উঠত যেন। তার বোন খেলা তো ঘুমিয়েই পড়ত। কোলে তুলে বসিয়ে মুখের ভিতর দুধ-ভাত দলা পাকিয়ে গুঁজে দিত মা।

বিয়ে যখন ঠিক হল, তখনও তেমন খারাপ কিছু মনে হয়নি। সে নিজে তখন সবে আঠারোয় পা দিয়েছে। মাথায় ঠেলে উঠেছিল অনেকখানি। গড়ন-পেটনও ভালো। মাজা পিতলের মত গায়ের রঙ আর একমাথা চুলে দেখাত চমৎকার। মেয়ে দেখতে এসে শাশুড়ির খুব পছন্দ হয়েছিল। শাশুড়ির এক সই-মাও গেছিল সঙ্গে। সে আবার একটু খুঁতখুঁতে মানুষ। বলে কীনা,

বড্ড ঢ্যাঙা মেয়ে রে সই। পা-দুখানা কেমন কুলোপানা দেখেছিস। এসব মোটে সুলক্ষ্মণ নয়।

শাশুড়ির কিন্তু পছন্দ হয়নি কথাগুলো। গরম গরম আলুর চপ দেওয়া হয়েছিল খেতে। তারই একখানা ভেঙে ফুঁ দিতে দিতে মুখে পুরে বলেছিল,

তুই চুপ যা। মহাদেব আমার উঁচা, লম্বা। তারসঙ্গে মানানসই মেয়ে হতে হবে তো। এতটুকুন গুটলেপানা বউ আনলে মানাবে কেন ? তারপর তো ছেলেপুলেও হবে সব ডাব-ডাব। মেয়ে লম্বা হবে আর তার পা দুখানা হবে এতটুকুন চালতের খোলের মত, তাই কখনও হয় নাকি। ঘর-দোর আমার পছন্দ হয়েছে। এখানেই লাগিয়ে দেব।

দুই সইয়ে ফিসফিস করে কথা বলছিল। তাও খেলা নাকি চৌকির আড়ালে গুঁড়ি মেরে বসে সব শুনেছিল। পরে চলে-যেতে সেসব কথা নিয়ে বাড়িতে কত হাসাহাসি। এখন অবশ্য শাশুড়ি মাঝে-সাঝেই সইয়ের নাম তুলে বলে সে নাকি তখন ঠিক বুদ্ধিই দিয়েছিল। তার কথা না শুনেই আজ এমন দুর্ভোগ। আর এই দুর্ভোগটা যে কেন সেটাই কিছুতেই মালার মোটা মাথায় ঢোকে না।

বিয়ের পরপর যদিও দুর্ভোগ তেমন কিছু বোঝা যায়নি। তার বর মায়ের কথায় ওঠে-বসে ঠিকই কিন্তু এমনিতে লোক মন্দ নয়। রাগ-ঝাগ হলেও সহজে বউয়ের গায়ে হাত তোলে না। হম্বি-তম্বিও খুব বেশি নেই। নেশা-ভাঙ করে না। কখনও বন্ধুরা এল তো গিয়ে দেশি মদের দোকানে বসল সেকথা আলাদা। কিন্তু রোজ রাতে নেশা করে বাড়ি ফিরে, চেঁচামেচি করা তার স্বভাব নয়। চাষের কাজ করে মন দিয়ে। তাসের নেশা আছে। বাড়ি এসে টুকচান মুখে দিয়েই ছোটে তাসের আড্ডায়। সেখানে অল্প-বিস্তর জুয়াও চলে বলে মালার ধারণা। তবে ঘরের ঘটি-বাটি বেচে জুয়ার আসরে টাকা ঢালার স্বভাব তার বরের নয়।

সবই ঠিক ছিল। কিন্তু গণ্ডগোলটা শুরু হল রত্না হওয়ার পর। বাড়ির বড়ছেলে মহাদেব। তার প্রথম সন্তান। শাশুড়ি ধরেই নিয়েছিল বউয়ের ছেলে হবে। কিন্তু হল তো মেয়ে। তাতেই বাড়িতে শুরু হল সাংঘাতিক অশান্তি। মেয়ে বিইয়েছে যে বউ, তার মত অলুক্ষুণে আর কে আছে? পরের বাড়ি থেকে এসে তার ছেলের ঘাড়ে খানিক দায় চাপিয়ে দিল বলে শাশুড়ি উঠতে-বসতে গাল দিত মালাকে। মালার মেয়ের বিয়ের ভার তো আর তার ছেলের শ্বশুর নেবে না। সে তো নিজের মেয়েকে বেড়াল পার করে দিয়েছে। এখন তো এই মেয়ের খাওয়া-পরা থেকে বিয়ে দেওয়া সব দায় তার ছেলের। শাশুড়ির নিজের কোনও মেয়ে নেই। দুটিই ছেলে। তার মতো বউ যে শ্বশুরবাড়ির কত বড় সম্পদ সেকথাও উঠত বারবার। মালা আর কী করে। মেয়ের মা হওয়ার অপরাধে মুখ শুকনো করে ঘরের কাজ করে যেত।

তাও প্রথম সন্তান মেয়ে শাশুড়ি কোনওরকমে সহ্য করেছিল। রত্না যখন বছর তিনেকের তখন আবার পেটে বাচ্চা এল মালার। শাশুড়ি বলেই রেখেছিল এবার ছেলে না হলে বউকে বাপের বাড়িতে রেখে আসবে। মালাও ঠাকুরকে ডাকছিল প্রাণপণে। পাশের গাঁয়ে পীরের দরগায় গিয়ে ঢিলও বেঁধে এসেছিল। কিন্তু এরপর হল পান্না। শাশুড়ি মুখে বললেও বউকে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে পারেনি। লোকজন কী বলবে সেটাও তো ভাবতে হয়। তাছাড়া মালাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিল সংসারে ভূতগত খাটুনি খাটবে কে? ততদিনে মালার দেওরের বিয়ে হয়েছে আর বছর না ঘুরতে সে বউ ছেলের মা-ও হয়ে গেছে। তার ফলে ছোট বউয়ের সঙ্গে তুলনা করে মালাকে খোঁটা দেওয়ার সুযোগও বেড়েছে শাশুড়ির।

ময়না যখন পেটে এল তখন তো শাশুড়ির মুখ দেখে ভয় লাগত মালার। সারাক্ষণই বুকের ভিতর ধুকপুক। অথচ কিছু তো করার নেই। পান্না যখন হল, তখনই ডাক্তারদিদিকে সে জিজ্ঞাসা করেছিল কী করলে সে ছেলের মা হতে পারবে? ডাক্তার তো হেসে বলে দিল ছেলের মা হওয়ায় নাকি বউয়ের কোনও হাতই নেই। স্বামী-স্ত্রীর মিলনের সময় ছেলেদের শরীর থেকে একটা বিশেষ জিনিস যদি মেয়েদের শরীরে ঢোকে তবেই পেটে ছেলে বাচ্চা আসবে। মেয়েদের শরীরে নাকি সেই ছেলে তৈরির জিনিসটাই থাকে না। কিন্তু এসব কথা তার শাশুড়িকে কে বোঝাবে? তার তো বদ্ধমূল ধারণা বউয়ের দোষেই ছেলে হচ্ছে না।

ময়না হওয়ার পর কিন্তু মুখে কিছু বলেনি শাশুড়ি। মুখ কালো করে ঠোঁট টিপে ছিল। কিন্তু ছেলের সঙ্গে মিলে যে অন্য মতলব এঁটেছে বুঝতে পারেনি মালা। পেট ভরে খাওয়া জোটে না। শরীর দুর্বল। মেয়েটা বুকের দুধ টেনে খাচ্ছে। সবমিলিয়ে রাতে একবার বালিশে মাথা দিলে আর জ্ঞান থাকত না তার। কিন্তু তাও যেন কী করে আঁচলের টানটা আলগা হয়ে যাওয়ায় টের পেয়েছিল। ময়না মোটাসোটা বাচ্চা। বুকের কাছে নিয়ে শুয়েছিল। হঠাৎ হালকা লাগায় ধড়মড় করে উঠে বসে দেখে মেয়ে নেই। ঘরের কোণে একখানা সলতে নামিয়ে লম্ফ রেখেছিল। সেটা নিভে গেছে। দরজার পাল্লাটা আধখানা খোলা, হাওয়ায় দুলছে। শেয়ালে নিল নাকি? পাগলের মত ছুটে ঘর থেকে বেরিয়েছিল মালা। আর তখনি চোখে পড়েছিল তার বর আর শাশুড়ি এই মাঝরাতে হনহন করে পুকুরধারের দিকে যাচ্ছে। বরের কোলে সাদা মত কাপড়ে জড়ানো কী একটা যেন রয়েছে। আর কোনওদিকে না তাকিয়ে ছুটেছিল মালা। গায়ের আঁচল খুলে লুটিয়ে গেছিল মাটিতে, ফিরেও দেখেনি। ছুটে গিয়ে বাঘিনির মত বরের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল মেয়েকে। ততক্ষণে তেড়ে এসেছে শাশুড়ি। কচি মেয়েকে প্রাণপণে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠেছিল মালা,

আমার মেয়ের গায়ে হাত দিলে তোমাদের পুলিশে দেব আমি। খুনের দায়ে জেল খাটাব বলে রাখছি।

বউয়ের ওরকম ভয়ঙ্কর চেহারা আগে কখনও দেখেনি মহাদেব। শাশুড়িও বোধহয় থতমত খেয়ে গেছিল খানিকটা। সেই সুয়োগে একছুটে নিজের ঘরে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল মালা। তারপর বাচ্চাটাকে বুকে জড়িয়ে আকুল হয়ে কেঁদেছিল অনেকক্ষণ।

এই ঘটনার পর মেয়েকে মেরে ফেলার চেষ্টা আর করেনি কেউ। তবে অত্যাচারের কোনও কমতি ছিল না। কথায় না কথায় চড়-চাপড়টা পড়তই। তারমধ্যেই রত্না আর পান্না ইস্কুলে ভর্তি হল। বাড়ির কারও ইচ্ছে ছিল না এতটুকুও। কিন্তু বিনা পয়সার ইস্কুল। মালা নিজেই একদিন নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিল। ছেলে-মেয়েকে স্কুলে পাঠানোর জন্য পঞ্চায়েতের চাপ আছে। তাছাড়া ইস্কুলে গেলে একবেলা খেতে পাবে। বাড়ির খাওয়ার খরচ কমবে। তাই শাশুড়ি অনেক কথা শোনালেও বাধা দিল না। যদিও পষ্টাপষ্টি বলে দিল মেয়েদের ইস্কুলে পড়ানোর জন্য সংসার থেকে একটি পয়সাও খরচ করা হবে না। মা যে রকম অকম্মার ঢিপি, একটা ছেলে বিয়োনোর পর্যন্ত ক্ষমতা নেই, মেয়েরাও তো তেমনি হবে। তবু তাদের পরের ঘরে পাঠাতে কিছু খরচ সংসারের হবেই। এর বাইরে আর কিছু করার ক্ষমতা তার ছেলের নেই।

ছেলে হয়নি মানে তার যে কোনও গুণ নেই একথা প্রতিদিন শুনতে শুনতে আর গায়ে লাগত না মালার। কিন্তু দুঃখ হত, চোখে জল এসে যেত অন্য জায়গায়। দেওরের দুই ছেলে। নাতি-নাতনিদের একসঙ্গে খেতে বসায় শাশুড়ি। তারপর দুধ-ডিম সব নাতিদের পাতে দেয়। রত্না, পান্না বড় হয়েছে একটু। অনেক কথা বোঝে। কিছু না বলে অন্যদিকে তাকিয়ে ডাল দিয়ে ভাত মেখে খেয়ে উঠে যায়। কিন্তু ময়নাটা ছোট। সে কাঁদে। ডিমের দিকে হাত বাড়ায়। শাশুড়ি কটকট করে বলে,

যেমন লক্ষ্মীছাড়া মা, তেমনি তার মেয়ে। সারাক্ষণ শুধু ভাইদের পাতের

দিকে নজর।

কান্না পায় মালার। দু-একবার হাঁস-মুরগির ঘর থেকে ডিম চুরি করে এনে মেয়েকে দিয়েছে। কিন্তু সে তো গোণাগুনতি ব্যাপার। জানতে পেরে অনর্থ করেছে শাশুড়ি। নিজেকে সত্যিই অপদার্থ মনে হত মালার। ইচ্ছে করত ঘর-দোর ছেড়ে যেদিকে দু-চোখ যায় চলে যেতে। কিন্তু সে চলে গেল তার মেয়েগুলো মরে যাবে, এই ভয়ে পারত না।

বাড়ি থেকে বেরোনো শাশুড়ি পছন্দ করে না বলে কোথাও তেমন যাওয়া-আসা ছিল না কোনওদিনই। এক ওই পালপাড়ার সাবুর বাড়িতেই যেত মাঝে-সাঝে। সমবয়সী দুজন। বন্ধুর মতন। সাবুর বর শহরে কাজ করে। ভোরবেলা বেরিয়ে যায়, রাতে ফেরে। একা মানুষ। ছেলেপুলে নেই। শাশুড়ি আপত্তি করত না ওর কাছে গেলে। তাই সাবুর কাছেই মনের কথা উজাড় করে দিত মালা। কাঁদত গলা জড়িয়ে ধরে। সাবুর কিছু করার নেই। সেও হা-গরীব। তবু সান্ত্বনা দিত বন্ধুকে। এরকমই একদিন সাবুইয়ের ঘরে গিয়ে দেখে কতগুলো মাটির পুতুলে রঙ করছে সাবু। ওর চেনা কে নাকি দিয়ে গেছে। একশখানা পুতুল রঙ করে দিলে পঞ্চাশ টাকা দেবে।

তুইও হাত লাগা না আমার সঙ্গে। তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে তাহলে। রঙ করতে জানিস?

সাবুর কথায় ঠোঁট টিপে হেসে মালা বলেছিল,

তোর থেকে ভালো পারব। পোটোপাড়ার পাশে বাড়ি ছিল না আমাদের। কুমোরদাদার সঙ্গে বসে অমন কত রঙ করেছি।

দিব্যি চটপট্ রঙ করে ফেলেছিল পুতুল। চোখ-নাক এঁকে দিয়েছিল। সাবুর সঙ্গে গল্পগাছা করে মন একটু হালকা হতে বাড়ি ফিরেছিল। ওমা তার কদিন পরে সকালে সাবু এসে চুপিচুপি তার আঁচলে পঁচিশটা টাকা বেঁধে দিয়ে বলল,

তোর কাজ খুব পছন্দ হয়েছে ওদের। আরও পুতুল দিয়ে গেছে। সুযোগ বুঝে দুপুরবেলা চলে যাস।

সাবু চলে যাওয়ার পর সেদিন নিজের রোজগারের টাকা কটা হাতে নিয়ে থরথর করে কাঁপছিল মালা। একফাঁকে ঘর থেকে বেরিয়ে পাড়ার দোকান থেকে তিনখানা কাগজে মোড়া কেক কিনে নিয়ে এসেছিল। কেক পেয়ে মেয়েরা কী খুশি !

কেক কে দিল মা?

রত্নার প্রশ্নের উত্তরে মুখ টিপে হেসে বলেছিল,

খা না। আমি কিনেছি। আমার টাকায় কিনেছি।

সেই শুরু। প্রথমে পুতুল রঙ করা। তারপর চালচিত্র এঁকে দেওয়া। মাঝে মাঝে কাঁথার কাজ। আঁচলের ভিতর লুকিয়ে বাড়ি এনে রাতে ঘরের দরজা বন্ধ করে করত। মেয়েরা জানত। কিন্তু কোনওদিন একটা কথাও বলেনি কাউকে। এমনকি পুঁচকে ময়নাও নয়। মেয়েদের ইস্কুলের বই-খাতা-পেন্সিল কেনার জন্য আর হাত পাততে হত না কারও কাছে। শাশুড়ির ডিমের হিসেব ঠিক থাকে। কিন্তু রাতের রান্না সেরে লুকিয়ে মেয়েদের জন্য আলাদা করে ডিমসেদ্ধ করে রাখে সে। ঘরে নিয়ে গিয়ে খায় তিনজনে। কেউ টের পায় না। শুধু মালা বুঝতে পারে একটু একটু করে জগতটা বদলে যাচ্ছে তার।

সাবুর বাড়িতেই একদিন শোভাদিদির সঙ্গে আলাপ হল তার। শোভাদিই রঙ করার জন্য পুতুল পাঠিয়েছিল সাবুর কাছে। সাবুর মত আরও অনেক মেয়েকে কাজ দেয় দিদি। তারপর সেসব বিক্রি করে টাকা ভাগ করে দেয়। জিনিস বেচার জন্য কলকাতা, দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি এসব জায়গায় মেলায় মেলায় ঘুরে বেড়ায় শোভাদি। এমনকি দিল্লি-মুম্বইও নাকি যায়। মেয়েরা কেউ সঙ্গে যেতে চাইলে তাদেরও নিয়ে যায়। কালো-কোলো লম্বা মানুষটি। মাথায় মস্ত খোঁপা। মুখখানা সবসময় হাসিতে ভরা। মালার নাম শুনেই ঘাড় নেড়ে বলল,

জানি জানি, ভারী সুন্দর হাতের কাজ তোমার। কেমন সুন্দর রঙ মেলানো পুতুল, প্যাঁচা, টিয়াপাখি করেছো। সব বিক্রি হয়ে গেছে। কাঁথাগুলিও সুন্দর হয়েছে। হ্যাঁ গো মেয়ে, তুমি সরা, পট এসব আঁকতে পারো?

মালা একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলেছিল,

কুনওদিন তো আঁকি নাই দিদি। তবে বাপের ঘরে যখন বিয়ে-চূড়োয় আলপনা দিতাম, সবাই ভালো বলত। ঠাকমা বলত, মালা আঁকলে ঘরখানা যেন উজল হয়ে যায়।

বেশ, বেশ তাহলেই হবে। পারবে তুমি। আমি সরা পাঠিয়ে দেব কখানা। এঁকে দিও। সরা আজকাল ভালো দামে বিক্রি হয়। আলপনাই আঁকতে হবে, তা কিন্তু নয়। যেমন মন চাইবে তেমন আঁকবে কেমন। পটও পাঠাব। কিন্তু পরে। পট আগে দেখাতে হবে তোমায়। তারপর কাজ করবে।

দিদি সরা পাঠিয়ে দিয়েছিল বেশ কয়েকখানা। ইস্কুল থেকে ফেরার সময় রত্না আর পান্না ব্যাগে ভরে নিয়ে এসেছিল সাবুমাসির বাড়ি থেকে। রঙ, তুলিও পাঠিয়ে দিয়েছিল শোভাদি। দুপুরে-রাতে দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে বসে সরায় ছবি এঁকেছিল মালা। কোনওটাতে আলপনা। কোনওটিতে আবার নদীর ধারে গাছ, কাশফুল, গ্রামের ঘরের পিছনে ধানের মরাই, নৌকায় বসে আছে মাঝি এসব এঁকেছিল নিজের খেয়াল-খুশি মত। মা-দুর্গার অসুর বধের ছবিও এঁকেছিল একটাতে। শোভাদির খুব পছন্দ হয়েছিল মালার আঁকা সরা। দশখানা সরা বিক্রি করে এক হাজার টাকা পেয়েছিল মালা। ইস্কুলে যাওয়ার জুতোটা ছিঁড়ে গেছিল পান্নার। ডানপিটে মেয়ে। ছুটোছুটি, গুণ্ডামি করতে গিয়ে জুতো ফাটিয়েছে। কিন্তু ইস্কুলে তো আর বছরের মাঝখানে জুতো দেবে না। এদিকে ওদের বাবাও ঘরের টাকা দিয়ে আর জুতো কিনে দেবে না। মেয়েটা তাই খালি পায়েই ইস্কুল যাচ্ছিল। টাকাটা পেয়ে মালা তাই সাবুইয়ের বরকে দিয়ে পান্নার জন্য একজোড়া জুতো আনিয়েছিল। এদিকে ঠাকুমার কড়া চোখে ঠিক ধরা পড়েছে নতুন জুতো।

জুতো কোথায় পেলি তুই?

শাশুড়ির হাঁক শুনেই সেদিন বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠেছিল মালার। এই বুঝি সব ফাঁস হয় গেল। ছোট মেয়ে। ধমক খেয়ে যদি বলে দেয় মা কিনে দিয়েছে, তাহলেই তো গেল। কিন্তু দেখা গেল ছোট হলেও পান্নার বুদ্ধি পরিষ্কার। সে বেশ স্পষ্ট করেই ঠাকুমাকে বলে দিল,

খালি পায়ে ইস্কুলে যাচ্ছি দেখে দিদিমণি নতুন জুতো দিয়েছে।

শাশুড়ি মুখখানা গোমসা করে ঘরে ঢুকে গেল দেখে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল মালা।

একদিন শোভাদি এসে পট দেখিয়ে গান গেয়ে শোনাল। দেখিয়ে দিল কেমন করে পট আঁকতে হয়। শিখে নিয়ে রামায়ণ, মহাভারত, ভক্ত প্রহ্লাদের কথা এই সব গল্প দিয়ে পট এঁকে দিত মালা। গল্পটা অবশ্য শোভাদি লিখে দেয়। সেটাকে মুখে মুখে ছড়ার মত খানিকটা বানিয়েও দেয়। শুনে লিখে নেয় মালা। বেশ কয়েকটা পট আঁকার পর এখন শুনে শুনে অভ্যাস হয়ে গেছে। নিজেও খানিকটা বানাতে পারে। শোভাদি হেসে বলে, মালা তো দিব্যি ছড়া কাটতেও শিখে গেল দেখছি।

সেদিনও সেরকম হাসাহাসি করতে করতেই বলল,

এখন তো মেলার কাজের চাপ নেই। একটা অন্যরকম কাজ কর দিকি...

কীরকম কাজ গো দিদি? জানতে চেয়েছিল মালা।

ব্যাগ থেকে একখানা পট বার করেছিল দিদি। এমনি পটের থেকে একটু মাপে বড়।

এই দ্যাখ, এই পটে ছবি আঁকবি। এতদিন যেমন রামায়ণ, মহাভারতের গল্পের ছবি এঁকেছিস, তেমন নয় কিন্তু। তোর নিজের মত ছবি। যে কথাটা তোর মনে হয় সবাইকে জানানো দরকার, তেমন ছবি। সঙ্গে কিন্তু ছড়াও লিখতে হবে। তুই পারবি আমি জানি। কিন্তু তাও যদি মনে হয় ছড়াটা লিখতে অসুবিধা হচ্ছে, তাহলে আমায় বলবি, লিখে দেব। করে রাখিস। দশ দিন বাদে এসে নিয়ে যাব।

শোভাদির কথা শুনে তো তার মাথায় হাত। কী লিখবে সে? তার আবার কোন কথা সবাইকে জানানো দরকার মনে হয়? কিছুই মাথায় আসে না। শেষকালে অনেক ভেবে-চিন্তে নিজের সবথেকে কষ্টের কথাগুলোই মালা লিখে ফেলল পটে। পুত্র আর কন্যে / এই দুই রত্নে / জগত্ চালায় জগত্পতি। কন্যার মূল্য নাই/ মনে যদি ভাবো তাই /সেকথা জেনো ভুল অতি। পুত্র-কন্যা সম মান

/দিবে যত্ন দিবে ধন/এই হল জগতে নিয়ম। কন্যাকে হেলা করি/ দুঃখ যদি দাও ভারী / সে পাপ হবে না খণ্ডন। দুগগা-লক্ষ্মী-সরস্বতী/ সবাই দেখো নারী জাতি/দেবী পুজা করি গো সবাই। দেবী জ্ঞানে কন্যাটিরে/ যত্ন কর প্রাণভরে / পাইবে গো ফলও তারই। হীরের টুকরো মেয়ে / উঠিবে ঝলমলিয়ে / আলোয় ভরিবে গো ঘর। কন্যাসন্তান কোলে নিয়ে/ বলো তাই জোর দিয়ে / মেয়েই হোক চেয়েছিলাম বর।

ছবিও আঁকল তার সঙ্গে। তারপর পাঠিয়ে দিল শোভাদিকে। দিদি এসেছিল তারপর। কিন্তু লজ্জায় তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারেনি মালা। দিদিও ভালো-মন্দ বলেনি কিছু।

তার একখানা ব্যাঙ্কের বই হয়েছে। সেখানে কিছু টাকাও জমেছে। বারান্দায় শুয়ে আধো ঘুমে মালা ভাবছিল, এবার বোশেখ মাসে মাকে একখানা ভালো লালপাড় শাড়ি কিনে দেবে। ভাবতে ভাবতে ঘুমের মধ্যেই মনে হল শোভাদি যেন সামনে দাঁড়িয়ে আছে। স্বপন দেখছে ভেবে চোখ বুজতেই রত্নার গলা। ঠেলছে রত্না,

মা, দ্যাখো দ্যাখো কে এসেছে...

ধড়মড় করে উঠে বসেছে মালা। কী সর্বনাশ ! সত্যিই শোভাদি দাঁড়িয়ে আছে একগাল হাসি নিয়ে। ভয়ে তো মালার হাত-পা যেন পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছে। এদিকে মেয়েদের গলার আওয়াজে ততক্ষণে ঘর থেকে শাশুড়ি, জা বেরিয়ে এসেছে। ময়নার বাপও তখনই ঢুকেছে ঘরে। শোভাদির কিন্তু কোনওদিকে খেয়াল নেই। সে রীতিমত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে,

ওঠো ওঠো খবর শোনো...কী কাণ্ড তুমি করেছো জানো?.... তোমার ওই পটখানা ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে...সারা দেশে ফার্স্ট...চলো এবার দিল্লি গিয়ে প্রাইজ আনতে হবে...পঞ্চাশ হাজার টাকা...

শোভাদি কী বলছে কিছুই মাথায় ঢুকছে না মালার। শুধু পাদুটো যেন বড্ড কাঁপছে। রত্না আর ময়না লাফাচ্ছে। শাশুড়ি বিশেষ কিছু বোঝেনি। শুধু প্রাইজ আর টাকাটা শুনেছে। তাই বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করে,

থাম দিকি তোরা। কে পেরাইজ পেয়েছে শুনি... ক'টাকা পেরাইজ?

তিন মেয়ের মধ্যে পান্নাটাই সবথেকে মুখরা। নাচ থামিয়ে ঠাকুমার মুখের সামনে আঙুল নেড়ে বলে ওঠে,

মা পেরাইজ পেয়েছে গো... আমাদের মা... তোমার অকম্মা বউ... ফার্স্ট হইছে।... পঞ্চাশহাজার টাকা পেরাইজ পেয়েছে...

তিন মেয়ে মা-কে ঘিরে ঘিরে নাচছে। শোভাদি হাত বাড়িয়ে দিতেই তাকে জড়িয়ে ধরে বহুকাল পরে হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে মালা।

(পুনঃপ্রকাশিত)

ক্যুইজের উত্তর

১) রোডেশিয়া

২) ৫০টি

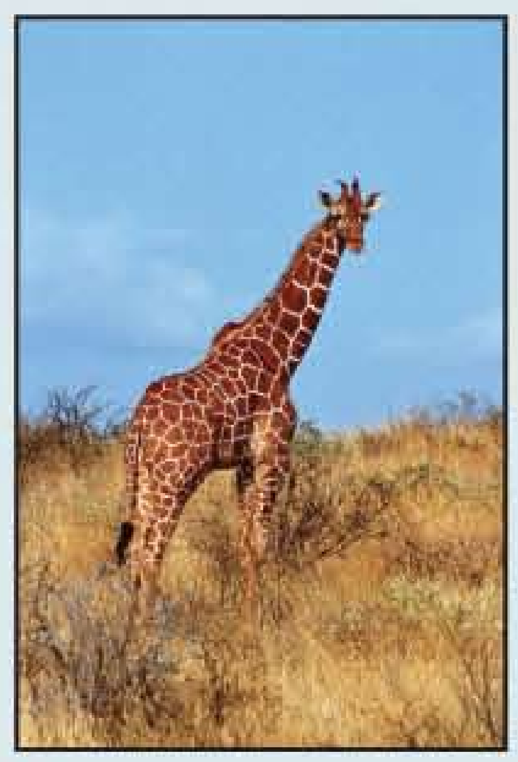

৩) জিরাফা ক্যামেলোপারডালিস

৪) পাওলো রোসি

৫) আভাস কুমার গাঙ্গুলি

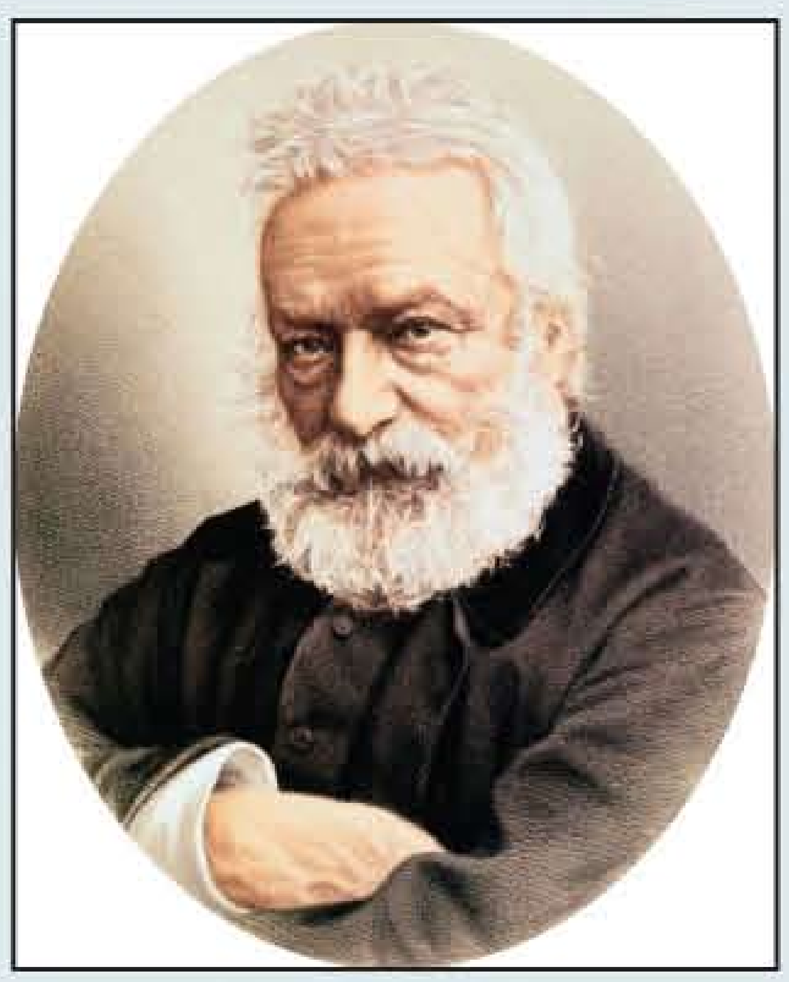

৬) জাঁ ভ্যালজাঁ

৭) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

৮) কুঠার

৯) ১৯২১ সালের ১ জুলাই

১০) কর্ণফুলী

সংবাদ

দুর্ঘটনায় প্রয়াত নিউ ইয়র্ক কালী মন্দিরের দুই অছি

বুদ্ধদেব মজুমদার ও অমিত শিকদার

জুনের ৬ তারিখের প্রত্যুষে, কালী মন্দিরের এক সহকর্মীর ফোন—দিলীপদা... ওকে শেষ করতে না দিয়েই এক গুচ্ছ উৎকণ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—এত ভোরে ফোন করছ, সব ঠিক আছে তো? উত্তর পেলাম, 'না, ভালো নেই, বুদ্ধদা আর অমিতদা আর নেই।' এ তিনটে শব্দের আঘাত যে এমন নিদারুণ হতে পারে, আগে কখনও বুঝিনি। ওরা বদ্রীনাথ ন্যাশনাল হাইওয়েতে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে। বুদ্ধ শুধু আমার সহপাঠী ছিল না, ও ছিল আমার ছোট ভাই। ওর মা আমাকে পুত্রস্নেহে বুকে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, 'তুমিও আমার আর এক ছেলে।' সেই থেকে ওর সাথে বড় ছোট ভাই-এর সম্পর্ক হয়ে গেছিল, কখনও কখনও আমার উপর রাগ হত, আবার পরে বলত, 'কিছু মনে করিস না', বলে বুকে জড়িয়ে ধরত। আজ অনেক মিষ্টিমধুর স্মৃতি একটু একটু করে ভেসে উঠছে। বুদ্ধর উপর আমার খুব রাগ হচ্ছে, ও কথা দিয়েছিল ফিরে এসে কুমকুমকে (ওর স্ত্রী) নিয়ে আমার বাড়ি এসে পুরনো দিনের গল্প করবে, ও আমাকে নিয়ে স্নিগ্ধার (আমার স্ত্রী) সাথে আমাকে নিয়ে নানারকম ঠাট্টা করত, আর আমরা সকলে হাসতাম। আজ সামনে পেলে ওকে বলতাম, 'আমরা সকলে এমন কী দোষ করেছি যে তুই, আমাদের কিছু না বলে এ ভাবে চলে গেলি, "আবার আসার" কথাটা রাখলি না। তুই আমাদের থেকে দূরে থাকতে পারবি না, তুই আমাদের খুব কাছে আছিস। ঠিক এখানে, রক্তে রাঙানো ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের অন্তঃস্থলে।'

২০০৫ এর জুলাই-এর শেষের দিকে বলডুইন-এ কালী মন্দির প্রতিষ্ঠার পর অমিতের সাথে আমার আলাপ হয়। সুদর্শন যুবক, মুখের মিষ্টি হাসিতে আকর্ষন ছাড়াও আনন্দের একটা সুগন্ধ ছিল। মন্দিরের প্রয়াত পুরোহিত অমলদার কাছে শুনেছিলাম, অমিত প্রতিদিন মন্দিরে এসে ধ্যানে বসত। অমিত শীঘ্রই মন্দিরে সকলের মন জয় করে নিয়েছিল। ইদানীং কালে অমিত মন্দিরের জন্য নিজেকে সমর্পন করেছিল, অমিতের জন্য সকলের মনে অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ফুটন্ত হয়ে উঠেছিল। এ যাত্রার পূর্বে অমিত আমার কাছে কামাক্ষ্যা মন্দিরের পুরোহিতের (আমাদের পারিবারিক) ফোন নম্বর চেয়েছিল। আমি খুশি মনে ওকে ফোন নম্বর দিয়েছিলাম এবং ওদের কামাক্ষ্যা দর্শনের ব্যবস্থা করেছিলাম। কামাক্ষ্যা দেবীর দর্শনের আগেই ওরা ইহলোকের মায়া পরিত্যাগ করে সর্ব মঙ্গলময়ী দেবী মহাকালীর চরণে চিরকালের জন্য নিজদের সমর্পন করে দিল। অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের কালী মন্দিরের ভার বহনকারী দুটি স্তম্ভের পতন হল।

বুদ্ধবাবু তাঁর পত্নী কুমকুম, পুত্র অরণি ও পুত্রবধু জুলিয়ানা, কন্যা পূজা ও জামাতা মাইকেল, ও দুই নাতি নাতনীকে রেখে গেছেন।

অমিতবাবু তাঁর স্ত্রী রূপা, দুই পুত্র শান ও রোহনকে রেখে গেছেন।

পরিশেষে একটা কথা-ই অমিত আর বুদ্ধকে বলব "স্বর্গলোকের সুরভিত আনন্দলোকে ভালো থেকো। তোমরা ভুলে গেলেও আমরা কোনও দিন তোমাদের ভুলব না, প্রার্থনা করি, মা কালীর আশীর্বাদে তোমরা দুজনে যেন আমাদের সকলের হৃদয়ের মণিকোঠায় চিরকালের জন্য সযত্নে সুরক্ষিত হয়ে থেকো।

সংবাদ বিচিত্রায় লেখা পাঠানোর নিয়মাবলী

যে কোনো একটি বিভাগে একবারে একটিই লেখা পাঠাবেন।

লেখা পাঠানোর ইমেল

cabsangbadbichitraeditors@gmail.com

১) কবিতা পাঠাবেন একটি ১২-২০ লাইনের মধ্যে।

২) অনু কবিতা পাঠাবেন একটি ৬-৮ লাইনের মধ্যে।

৩) অনুগল্প পাঠাবেন ২৫০-৫০০ শব্দের মধ্যে।

৪) গল্পটিকে ন্যুনতম ১২০০ এবং সর্বোচ্চ ১৫০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

৫) সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সমাজ সম্পর্কিত প্রবন্ধ / নিবন্ধ পাঠাবেন ৫০০ (নিবন্ধ) থেকে ১০০০ (প্রবন্ধ) শব্দের মধ্যে।

৬) শিল্প, সংস্কৃতি বিষয়ক কমিউনিটি নিউজ পাঠাবেন ১০০-৫০০ শব্দের মধ্যে। আপনার কমিউনিটির পরবর্তী প্রজন্মের যে কোনও বিষয়ে সাফল্যের খবর দেওয়া যাবে।

৭) লেখাটি অভ্রতে টাইপ করে একটি .docx ফাইলে পাঠান। হাতে লিখে, pdf করে, ছবি তুলে পাঠালে গৃহীত হবে না।

৮) লেখাগুলিকে অবশ্যই যে কোন মাধ্যমে অপ্রকাশিত ও মৌলিক হতে হবে।

৯) বানান ও যতিচিহ্নের ব্যবহারে লেখকদের সতর্ক থাকতে হবে।

১০) লেখায় সরাসরি যে কোন রাজনৈতিক দল, ধর্ম, জাতি, জনজাতির উল্লেখ থাকলে বা কোনো বিতর্কমূলক লেখা অথবা ব্যক্তিবিশেষের নাম করে বা ইঙ্গিত করে সম্মানহানির প্রয়াস থাকলে সেটি বিবেচিত হবে না।

মনে রাখবেন নিয়মাবলী মেনে লেখা না পাঠালে বা শব্দসংখ্যা বেশি থাকলে লেখা প্রকাশ সম্ভব নয় কারণ মাত্র ১৬ পাতার পত্রিকা এটি। এটি বিশেষত সংবাদ পত্রিকা তাই কমিউনিটি নিউজ প্রকাশ আমাদের প্রধান লক্ষ্য। বাঙলার শিল্প-সংস্কৃতির প্রচার-প্রসারের সাথে যুক্ত যে কোনও সংস্থার সংবাদ আমরা প্রকাশ করব। আপনারা আপনাদের সংস্থার কর্মকান্ডের সংবাদ পাঠান, সম্পাদকমন্ডলী দ্বারা বিবেচিত হলে আমরা সেইটি ছাপব।

আপনাদের মতামত আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ

সংবাদ বিচিত্রা পত্রিকাটি বিষয় ভিত্তিক এবং আঙ্গিক ভিত্তিক পর্যালোচনা করে আপনাদের কেমন লাগছে ইমেলে জানান। যদি কোথাও পরিবর্তন বা উন্নতিসাধন করতে হয় সংক্ষেপে দু-চার লাইনে ইমেল করে কারণ সহ জানাবেন আমরা আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করব।

cabsangbadbichitraeditors@gmail.com

Rules for submitting articles to Sangbad Bichitra

Submit only one text at a time in any one category.

Send articles to this email:

cabsangbadbichitraeditors@gmail.com

1) Poems should be within 12-20 lines.
2) Short poems should be within 6-8 lines.
3) Short stories should be between 250-500 words.
4) Stories should be at least 1200 words but no more than 1500 words.
5) Essays/articles related to literature, science and social issues should be less than 500 (for an article) to 1000 (for an essay) words.
6) News form within your local community about art, culture, etc. should be within 100-500 words. Success stories of your next generation young members on any arena can be shared.
7) The text should be formatted in Avro font and stored as a MS Word (.docx) file. Handwritten content, an image (like JPEG or a PDF) file are not suitable formats and submissions will not be accepted.
8) Content should be previously unpublished and original.
9) Content should be free from typographical and grammatical errors.
10) Any content directly commenting on a political party, religion, caste, nation or a particular individual in a biased positive or negative manner will not be accepted for publication.

✻ Please understand that if the submitted content does not confirm to the guidelines set forth above (especially word limit), it will not be accepted for publication (due to space constraints of a 16-page magazine).

✻ This is a publication focused on community(ies) and our main aim is to publish news from any organization that promotes Bengali art and culture. As local Bengali organizations submit content to us, we will strive to publish items accordingly.

✻ Your opinion is important to us : Please provide your review (via email) of the contents of "Sangbad Bichitra" as it tackles pertinent subjects and viewpoints and their manner of presentation. If there is any room for improvement, please do not hesitate to describe them briefly and we shall publish your feedback in our subsequent edition.

cabsangbadbichitraeditors@gmail.com

Advertisement Rates for Sangbad Bichitra - 2023

(Color – Back Page)		1 Issue	1/2 Yearly	Yearly
Full Page	(14 x10 inch)	$250	$1,500	$2,500
1/2 Page	(10 x 7 inch)	$150	$750	$1,250
1/4 Page	(5 x 4 inch)	$100	$500	$1,000
1/8 Page	(5 x 2 inch)	$50	$250	$500

(Color – Inside)		1 Issue	1/2 Yearly	Yearly
Full Page	(14 x10 inch)	$150	$1,000	$2,000
1/2 Page	(10 x 7 inch)	$100	$500	$1,000
1/4 Page	(5 x 4 inch)	$75	$250	$500
1/8 Page	(5 x 2 inch)	$35	$150	$300

✻ Minimum three (3) issues.
✻ Payment is required in advance.
✻ Make check payable to : CAB
✻ Mail to :
Cultural Association of Bengal
✻ Address :
346 Yale Road, Garden City,
NY 11530, USA
✻ Zelle to : 516-965-5277

Editorial Committee

Sudipta Chattopadhyay
Lipika Mukhopadhyay

Board of Trustees 2023

Dilip Chakrabarti	Chairperson
Abhik Dasgupta	Member
Ashis Sengupta	Member
Ashok Rakhit	Member
Gopendu Chakrabarti	Member
Kallol Chattopadhyay	Member
Milan Awon	Member
Pranab Das	Member
Sugata Bagchi	Member
Surajit Sengupta	Member

Executive Committee 2023

Ranadeb Sarkar	President
Tapas Sanyal	Vice President
Arpita Gupta	Vice President
Dipayan Sarkar	Vice President
Partha Sarathi Chakrabarty	General Secretary
Indrashish Basu Roychoudhury	Assistant Secretary
Debiprosad Palit	Treasurer
Sudipta Chattopadhyay	Member
Dipankar Chattopadhyay	Member
Lipika Mukhopadhyay	Co-Opt Member
Amitabha Choudhury	Co-Opt Member
Amit Ganguly	Co-Opt Member
Pradip Gupta	Co-Opt Member
Hasanuzzaman Saki	Co-Opt Member
Piya Roy	Co-Opt Member

Published by

Rupa Majumdar, RAUNAQ PUBLICATION

Sangbad Bichitra—July 2024. Digital Version. Published by Cultural Association of Bengal, North America.
In assistance with Raunaq Publication.